বাংলা (পঞ্চম পত্র)

স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

পর্যায় ঃ ২ ঃ শৈলীবিজ্ঞান

একক ঃ ১ - ৫

একক ১ ❑ শৈলীবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব

১.১ স্টাইল : রীতি না শৈলী

১.২ শিকড়ের খোঁজে—ভারতীয় রীতিবাদে

১.৩ শৈলীর সংজ্ঞা ও অস্তিত্ববিচার

১.৪ ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার : কৃতি ব্যাখ্যান

১.৫ রাশিয়ান ফর্মালিজম্

১.৬ সাহিত্যিক অবয়ববাদ

১.৭ নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ (নিউ ক্রিটিসিজম্/নিও-স্ট্রাকচারালিজম)

১.৮ অবয়ববাদ : প্রাগ-গোষ্ঠী

১.৯ শৈলীবিজ্ঞান : নানা মহল

১.১০ উপলক্ষের মানক (কনটেক্সট প্যারামিটার)

১.১১ আমাদের মতামত : নূতন পথ

উল্লেখসূচী

উৎস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

ওড়িয়া

ইংরেজি

১.১ ❑ স্টাইল : রীতি না শৈলী

প্রতিদিনের কথাবার্তায় যখন 'স্টাইল' শব্দটা আসে, তখন তা অনেক হালকাভাবে বলা হয়। আবার লেখক-আলোচকমহলে শব্দটি গভীর অর্থ বয়ে আনে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, সাধারণ আলাপে আর পণ্ডিতি আলোচনায় শব্দটির লক্ষ কিন্তু একদিকে। দুপক্ষই ব্যক্তি বা লেখার বৈশিষ্ট্য বোঝাতে চাইছেন।

শব্দটির ইংরেজিয়ানা নিয়ে কারোর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি কি একান্ত ইংরেজি শব্দ? অভিধানের সাক্ষ্য ধরে সময়ের দিক থেকে আরেকটু পিছিয়ে যেতে পারি। লাতিনে একটি শব্দ আছে—'স্টিলোস'। স্টিলোসের মানে হল মোমের চৌকো টুকরোর উপর লেখার জন্য ছুঁচলো কলম। পরে সাহিত্যকৃতি বা রচনা সম্বন্ধে 'স্টাইল' শব্দের ব্যবহার শুরু হল। আবার এখন স্টাইল বলতে পুরো সাহিত্যকর্ম বা রচনাকে বোঝায় না। একজন বা একটি গোষ্ঠীর লেখার স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যকে বোঝায়। অর্থাৎ একটা ব্যক্তিত্বের ছাপকল্পনা, স্টাইল বলা বা লেখার সময় সক্রিয় থাকে।

স্টাইলের সংজ্ঞা, অস্তিত্ব, তত্ত্বধারণা এবং স্টাইলিস্টিকসের কথা বলার আগে একটা পারিভাষিক বিতর্ক তোলা যেতে পারে। স্টাইলের বাংলা পরিভাষা কি হবে, এ নিয়ে মতান্তর আছে। একদল শব্দটি স্বরূপে রাখতে চান। অন্যদলের মতে এর বাংলা হবে 'রীতি'। প্রথম দলের কাছে বাংলা পরিভাষার প্রয়োজন নেই। অতি-পরিচিত শব্দটির বাংলা লিপ্যন্তর করে তাঁরা খুশি হন। দ্বিতীয় দলের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এঁদের মত অনুযায়ী স্টাইলের বাংলা রীতি নয় কেন, এ নিয়ে ভাবা যেতে পারে।

এঁরা ভুলে যান যে, বাংলায় রীতি শব্দটি একার্থক নয়, নানার্থক। যেমন, (ক) প্রণালী, পদ্ধতি বা ধরন (চিকিৎসার রীতি, কথা বলা বা লেখার রীতি); (খ) প্রথা, ধারা বা দস্তুর (সামাজিক রীতি-নীতি, বিবাহের রীতি, পূজার রীতি); (গ) প্রকৃতি, স্বভাব বা আচরণ (ভদ্রতা বা ভদ্রলোকের রীতি, এমনকি গানে 'পিরীতির এ কি রীতি'-ও শুনি)।

রচনাস্বাতন্ত্র্য বোঝাতে এঁরা 'রীতি' পরিভাষার পক্ষপাতী। অথচ স্টাইল অর্থে রীতি ব্যবহারের অন্য অসুবিধাও আছে। একটি বাধা হল, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে রীতিবাদের ধারণা। বাংলায় স্টাইল অর্থে 'রীতি'-ব্যবহারকারীদের মনে সংস্কৃত রীতিবাদ অলক্ষে ছায়া ফেলেছে। হয়তো সেই 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য' বা 'বিশিষ্টা পদরচনা রীতি' ধরনের শব্দগুচ্ছ বা তার আড়ালের ধারণা এখানে সক্রিয়। অথচ সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে রীতিধারণা এক নয়, অনেক। কখনও তা বিশেষ পদান্বয়ের (সিনট্যাক্স) কৌশল, কখনও তা মার্গ (টাইপস্ অব রিজিওনাল লিটারারি ল্যাংগুয়েজ)।

প্রথম বক্তব্যে পদান্বয় কৌশল স্থান পেলেও সমস্ত ভাষিক কৌশল সেখানে স্থান পায়নি। দ্বিতীয় সূত্রে বলা গৌড়ী, লাটীয়া, বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ইত্যাদিতে আঞ্চলিক সাহিত্যধারণাই প্রবল হয়েছে। এদের কোনটাই স্টাইল নয়। ইংরেজি সমালোচনার সাধারণ পড়ুয়াও জানেন, স্টাইল বলতে এছাড়া আরও কিছু বোঝায়। আবার রীতিবাদে রসবাদ মাঝে মাঝে প্রভাব ফেলেছে। কুন্তকের মতো সচেতন রীতিবাদীও ধ্বনিবাদের মায়াবী কুহক এড়াতে পারেননি। রীতিকে কাব্যের আত্মা বলা আর অভীষ্ট ভাবপ্রকাশের তন্ময় (অবজেক্টিভ) সৌন্দর্যঘোষণা এক হতে পারে না। রীতির মূলে যে গুণের (লিটারারি এক্সসেলেন্স) কথা বলা হয়েছে, তাও বাক্যকে ছাড়িয়ে যায়। স্টাইল বলেত একালে যে তন্ময় উপাদান সমাহার [ধ্বনি-শব্দ-বাক্য-অর্থ এবং সমগ্র কৃতি (টেক্সট) ও লেখকব্যক্তিত্ব] বুঝি, মন্ময় (সাবজেক্টিভ) গুণ তা থেকে অনেক দূরের ব্যাপার। অন্যদিকে ধ্বনি ও রসবাদের আলো রীতিবাদের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ-কর্মে চিরকালই বাধা দিয়েছে।

সংস্কৃত রীতিবাদের অপূর্ণতা-অস্পষ্টতা এবং বাংলায় রীতির নানা অর্থ মনে রেখে অন্য পারিভাষিক শব্দ বাছতেই হয়। 'শৈলী' শব্দটি এমন কোনো জটিলতা আনে না। তাছাড়া গত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সাহিত্যালোচনা, এমনকি সংবাদপত্রেও দেখা যাচ্ছে 'রীতি'র চেয়ে 'শৈলী'র প্রচলন বাড়ছে। 'রীতি' বলার পক্ষপাতী পণ্ডিতেরাও পাশাপাশি শৈলী ব্যবহার করছেন দ্বিধায় পীড়িত হয়ে। আসলে 'শৈলী' শব্দের পৌনঃপুনিকতা (ফ্রিকোয়েন্সি) রীতির চেয়ে অনেক বেশি। কাজেই এই আলোচনার সব জায়গায় এখন থেকে স্টাইলের বদলে শৈলী শব্দটির ব্যবহারে আশা করি কেউ আপত্তি তুলবেন না।

১.২ ❑ শিকড়ের খোঁজে—ভারতীয় রীতিবাদে

একটু আগে পরিভাষার সন্ধান অংশে ভারতীয় রীতিবাদের কথা এসেছে। এবারে গভীরভাবে দেখা যাক, ভারতীয় রীতিবাদে শৈলীধারণার (নোশন অব্ স্টাইল) কোনো অস্তিত্ব আছে কি না? বেশ কিছু আলোচক ভারতীয় রীতিবাদে শৈলীধারণা আছে বলে মনে করেন। এ জাতীয় সিদ্ধান্তের মূলে সত্য ততটা নেই, যতটা আছে 'যা নেই, ভারতে, তা নেই ভারতে' গোছের বিশ্বাসের ব্যাপার। এই বিশ্বাস যে কতটা অন্ধ, তা যুক্তির পথে রীতিবাদের ব্যাখ্যায় বোঝা যাবে। কাব্যসংজ্ঞা লিখতে গিয়ে আলংকারিকরা অনেকেই ব্যাকরণের পরিভাষার আশ্রয় নিয়েছেন। কাব্যজগতের বিচিত্র রহস্যকে ভেদ করার জন্যে এই ব্যাকরণমান্যতা শৈলীর সামান্য ধারণা দেয়। প্রশ্ন ওঠে, এই সব চিন্তা পরিণামে কি দিয়েছে।

এই ধরনের সাহিত্য-সংজ্ঞা প্রথম দিলেন ভামহ। তিনি লিখলেন 'শব্দার্থসহিতৌ কাব্যম্'। শব্দ ও অর্থ সহিত বা মিলিত হলে কাব্য হয়। ব্যাকরণের বাচ্য-বাচক সম্বন্ধ এখানে গৃহীত হয়েছে। এই মতের লক্ষ্য ছিল—রচনার ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি, যথার্থ প্রয়োগ এবং সম্বন্ধের ঔচিত্য। ব্যাকরণগত বিশুদ্ধতা (গ্রামাটিক্যাল পিওরিটি) এবং উপলক্ষের বাঁধন (কোহেশন অব্ কনটেক্সট) ভামহ প্রথম উচ্চারণ করলেন। কিন্তু ব্যাকরণগত বিশুদ্ধি সার্থক রচনার প্রাণ নয়। হয়তো ভামহ সেকালের রচনায় ব্যাকরণগত অশুদ্ধির বন্যা দেখে এমন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কাব্যাঙ্গে দেখতে চেয়েছিলেন। নইলে ব্যাকরণের মাপকাঠি নিয়ে কাব্যের আশ্চর্য জগৎ যে গড়া যায় না, এটি তিনি বোঝেননি, এমন অলীক কথা বলতে হয়।

ভামহের পর এ ধরনের বক্তব্য উচ্চারণ করলেন দণ্ডী। তাঁর 'কাব্যাদর্শ'-এ মার্গধারণা আছে। এটি হল সাহিত্যভাষার রূপভেদ (টাইপস অব্ লিটারারি ল্যাংগুয়েজ)। এর আগে গুণ অলংকারশাস্ত্রে আলোচিত হয়েছিল। দণ্ডী দেখালেন যে, গুণ এবং অলংকার সমান নয়। গুণকে একেবারে খারিজ না করেও তিনি মার্গের লক্ষণবিচারে তা প্রয়োগ করেছেন। কাব্যরচনার কৌশলকে বৈদর্ভী এবং গৌড়ী—এই দুভাগে দণ্ডী বিভক্ত করেছেন। গুণকল্পনা থাকলেও দণ্ডী ও বামন এদের সংজ্ঞার্থ বদলেছেন। তবু দণ্ডীর রচনাতেই মার্গ তথা রীতিবাদের শুরু হল, একথা বলতে পারি। সংস্কৃত কাব্যতত্ত্বে এভাবে রীতিধারণার তিনটি স্তর ভাবা যায় :

১. আঞ্চলিক ভাষাদর্শ বা ঔপভাষিক রচনার সমালোচনা

২. আঞ্চলিক ভাষাদর্শের ধারণার বদলে একই পদ্ধতিতে আদর্শীকৃত রীতিধারণার সূচনা

৩. কুন্তকের রীতিব্যাখ্যানের নবীনতা—কবিচারিত্র নিয়ে প্রথম সচেতন অনুসন্ধানের শুরু।

দণ্ডীর পরে বামন প্রথম রীতি শব্দটি প্রয়োগ করেন। তাঁর কথায়, "রীতিরাত্মা কাব্যস্য। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ। বিশেষো গুণাত্মা। সা ত্রেধা বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী চেতি। বিদর্ভাদিষু দৃষ্টতাৎ তৎ সমাখ্যা। সমগ্রগুণা বৈদর্ভী।" অর্থাৎ "রীতি হল কাব্যের আত্মা। রীতির অর্থ বিশিষ্ট পদরচনাভঙ্গি। এই বিশিষ্টতার আত্মা হল গুণ। এভাবে বৈদর্ভী গৌড়ী পাঞ্চালী নামে তিনটি রীতি আছে। এর মধ্যে বৈদর্ভী হল 'সমগ্রগুণা' বা সমগ্র গুণের আকর।"

রীতির এই ধারণার মূলে আঞ্চলিক ভাষারূপ (রিজিওনাল ডায়ালেক্ট ফর্ম) প্রাথমিকভাবে সক্রিয় ছিল। পরে তা আঞ্চলিক সাহিত্যভাষার প্রকারভেদ (টাইপস অব্ রিজিওনাল লিটারারি ল্যাংগুয়েজ) হয়ে দাঁড়ায়।

সাহিত্য না অলংকার কোন্ গুণে বৈদর্ভী সে সময় সুখ্যাতি পেয়েছিল? বামন একে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যভাষার শিরোপা দিয়েছেন। বামনের কাছেও গুণ বড়ো। তবু সাহিত্যভাষার পদান্বয় তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করেছে।

রুদ্রট তাঁর 'কাব্যালংকারসূত্র'-এ আরেকটি মার্গ কল্পনা করলেন। সেটি হল লাটীয়া। এখানে মার্গ বা রীতির সংজ্ঞা পালটাল। রীতি তাঁর কাছে সমাসবতী বৃত্তি (নেচার অব্ কম্পাউন্ডিং)। সংস্কৃত সাহিত্যে সমাসবদ্ধতার বিন্যাস ও সমাহার রুদ্রটের কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল। তাই সমাসবদ্ধতার বিভিন্ন ছককে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন।

রাজশেখর 'কাব্যমীমাংসা'য় ব্যাকরণের বাচ্য-বাচক ছাড়া কিছু সাহিত্য-আলোচনায় ভাবতে চাননি—এরকম আলোচনা শোনা যায়। কিন্তু 'কাব্য-মীমাংসা'তেই 'পাক' বলে এক নতুন ধারণা ছিল। 'পাক' বলতে তিনি ভাষানৈপুণ্য বুঝেছেন। ব্যাখ্যাকার মঙ্গলের কথায়, পাক হল বিশেষ্য-ক্রিয়ার সম্মিতি (এগ্রিমেন্ট)। রাজশেখরের 'পাক'-ব্যাখ্যান ছিল ভাষার নিপুণ ব্যবহারকে কেন্দ্র করে। মঙ্গল তা সংকীর্ণ অর্থে ব্যাখ্যা করলেন। রুদ্রটের মতে, মঙ্গল সাহিত্যভাষার ব্যাকরণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি একচক্ষু ছিলেন। বিশেষ্যক্রিয়ার সম্মিতি তো যে-কোনো রচনার সাধারণ ব্যাপার। এই ধরনের রীতি-ব্যাখ্যান বেশ মামুলি। বামন রীতির আলোচনা শুরু করলেও বিস্তৃত স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দেননি। ক্ষেমেন্দ্র 'কবিকণ্ঠাভরণ'-এ ঔচিত্য, স্বজ্ঞা (ইনট্যুশন), উদ্দেশ্য ও উপলক্ষকে এনে রীতিবাদকে সামান্য উজ্জ্বলতা দিয়েছিলেন।

রীতিবাদ স্পষ্টতর, বিস্তৃত আলোচনার অপেক্ষায় ছিল। কুন্তকের 'বক্রোক্তি-জীবিত' রচনার আগে রীতির খণ্ড আলোচনাই বেশি করা হত। দীর্ঘ আলোচনা করলে চিন্তার শিকল যুক্তিপ্রবাহকে বেঁধে ফেলবে, এমন ভয়ে খণ্ড আলোচকরা তা করেননি। ব্যাকরণের নানান প্রভাব এবং আলোচকদের ব্যক্তিগত পক্ষপাত এর জন্য দায়ী ছিল।

কুন্তক বক্রোক্তিজীবিতে রীতিবাদের সীমা শুধু বাড়ালেন না, অগ্রজ রীতিবাদীদের খণ্ড চিন্তার সমালোচনাও করলেন। তাই কুন্তকের বক্রোক্তিবাদ একদিকে রীতিবাদের সমালোচনা এবং ভাষ্যকর্মের মিলিত ফল। অতীতের রীতিবাদের সমালোচনা কুন্তক এইভাবে করলেন :

১. অলংকার বা রীতিভেদ করতে গিয়ে যদি আঞ্চলিক ভাষাকে মানক ধরি, তাহলে সংজ্ঞায় অতিব্যাপ্তি দোষ আসে। অঞ্চল যদি হয় রীতিবিভাগের মানদণ্ড, তাহলে গণনাহীন রীতি কল্পিত হবে। রীতির ভৌগোলিক মানচিত্র এভাবে বিফল ও নিয়মহীন হয়ে পড়ে।

২. আঞ্চলিক সাহিত্যভাষার মধ্যে একটি মান্য (বা অতি-চর্চিত) রূপ অর্জন করে। এই আদর্শ সাহিত্যভাষা অঞ্চলের বেড়াজাল পেরিয়ে সর্বজনীন হতে পারে। যে-কোনো অঞ্চলের সাহিত্যিকই এর অনুসরণ করেন বলে সাহিত্যভাষার একাধিক আঞ্চলিক দাবি মেনে নেওয়া যায় না।

৩. রীতি যদি কাব্যের আত্মা হয় এবং তারও নানা ভাগ থাকে, তাহলে তার শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করা পক্ষপাতিত্বের পরিচায়ক। এই মতের বশে আগের রীতিবাদীরা গৌড়ী, পাঞ্চালীতে সার্থক কাব্য রচনার সম্ভাবনাকে বাতিল করেছেন। সমাজে গুণ-কর্মের বিভাগে চাতুর্বর্ণের উপযোগিতা থাকলেও রীতির ক্ষেত্রে বৈদর্ভীর অগ্রাধিকার-প্রস্তাব (সাজেশন অব প্রেফারেন্স) খানিকটা জোর করে করা।

কুন্তক রীতিবাদের বাঁধা পথ মানলেন না। তাই তিনি আঞ্চলিক ভাষাধারণানিরপেক্ষ কবিচিত্তবৈশিষ্ট্য খুঁজলেন।

বাঁধা পথ এখানে একেবারে ছাড়া যায়নি। বরং তা এক বাঁধনহীন গ্রন্থির সূচনা করল। স্রষ্টার মনোগহনের অন্ধকারে আলো ফেলার চেষ্টা শুরু হল। তাহলে কি সাহিত্যের পরম অর্থ নিয়ে তিনিই প্রথম চিন্তক? কুন্তক এমন দাবি করলেও তা মানা কঠিন। অথচ কবিদের 'অন্তরামোদমনোহারিত্ব' তাঁর কাছে নূতন ব্যাখ্যা প্রার্থনা করল, এটা অস্বীকার করা যায় না। কুন্তকের সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যানের অভিনবত্ব এইখানে যে, তিনি সাহিত্যকে অলৌকিক প্রকাশভঙ্গি মনে করলেও তার ন্যূনতা এবং অতিরেকবর্জিত মনোহারী শোভা ও রূপের কল্পনা করতে পেরেছিলেন।

কুন্তক রাজশেখরের সহিতত্ব ব্যাখ্যা মানলেন। আবার তার তন্ময় বিশ্লেষণও করলেন। তিনি মাত্রাজ্ঞানের উপর জোর দিলেন। শব্দ ও অর্থ মিলিত হবে সমতা রেখে, এমন সংযম তাঁর কাছে প্রার্থনীয় মনে হয়েছিল। শব্দ ও অর্থ কেউ কারোর চেয়ে বড়ো অথবা ছোটো হবে না। তারা হবে একে অপরের সমান অথচ রমণীয় (পরস্পর-স্পর্ধিত-রমণীয়)। সার্থক কাব্যে শব্দ ও অর্থের যথাযথ মিলন ঘটে। শুধু শাব্দিক সৌন্দর্য কানকে পরিতৃপ্ত করে। আর প্রকাশভঙ্গিহীন মহান ভাবনা তাঁর কাছে নিষ্প্রাণ মৃতদেহের মতো। প্রকাশভঙ্গি সুন্দর অথচ বিষয়বোধছিন্ন রচনাকে তিনি ঘৃণ্য রোগের মতো মনে করেছেন।

এই কাম্য অবস্থা কবি কীভাবে সৃষ্টি করবেন? কুন্তক এই জায়গায় বক্রতা বলে কবিব্যাপার কল্পনা করেছেন। ছটি বক্রতাব্যাপার কুন্তকের চোখে ধরা পড়েছে :

১. বর্ণবিন্যাসবক্রতা—বর্ণের বিশেষ প্রয়োগ (এ কি অনুপ্রাসের নামান্তর?)

২. পদপূর্বার্ধবক্রতা—একার্থক শব্দ, প্রচল শব্দ, শব্দের গৌণার্থ, বিশেষণ, গূঢ়োক্তি, সমাস, অনুসর্গ, ধাতু, লিঙ্গ এবং ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগ

৩. পদপরার্ধবক্রতা—কাল, কারক, বচন, বাচ্য, পুরুষবাচক সর্বনাম, অব্যয় এবং বিভক্তিহীন শব্দের বিশেষ প্রয়োগ

৪. বাক্যবক্রতা—সমস্ত অলংকার বিশেষত অর্থালংকার প্রয়োগ

৫. প্রকর্ণ-বক্রতা—বিভিন্ন অধ্যায়ের রচনা ও অবয়বকৌশল

৬. প্রবন্ধ-বক্রতা—সমগ্র কৃতির মধ্যে অভিনব সৌন্দর্যসৃষ্টির নিপুণতা

কুন্তকের বক্রতাব্যাপার সমালোচনার আগে তাঁর নির্দেশিত তিন জাতের কবিস্বভাব ব্যাখার দাবি রাখে। সুকুমার, মধ্যম এবং বিচিত্র বলে তিন ধরনের কবিস্বভাব আছে। সুকুমার কবিমনের অধিকারী প্রায় নিরলংকার রচনায় সহজাত শক্তিতে কবিত্ব সঞ্চার করেন। হৃদয়সংবাদ সেখানে এত স্বাভাবিক যে, অলংকার সেখানে প্রয়োজন হয় না। সমাসের বাড়াবাড়ি বা জটিলতা সেখানে নেই। শুধু স্নিগ্ধ প্রসাদগুণে সে রচনা প্রাণ পায়। একে সুকুমার বললেও, উঁচু দরের কবিত্ব এখানে আছে বলে এর অপর নাম 'অভিজাত'। মিডলটন মারীর বলা শৈলীর চূড়ান্ত অনুভব এই রীতিতে পাই যেখানে বিশেষ ও নির্বিশেষ একাকার হয়ে যায়। দ্বিতীয় জাতের কবিস্বভাব হল বিচিত্র। এখানে হৃদয়ের অনুভবের চেয়ে বুদ্ধি-বৈদগ্ধ্যের ঝলকই বেশি। কবি এখানে পরিশ্রমী। কিন্তু শব্দ-অর্থ সম্মিত নয়। মারীর বলা প্রকাশকৌশল (টেকনিক অব্ এক্সপ্রেশন) এখানে থাকলেও কাব্যসিদ্ধি ঘটে না। শেষ রীতি হল মধ্যম বা মিশ্র। এখানে সুকুমার ও বিচিত্র রীতি মিলে-মিশে যায়। মধ্যম রীতির কবিরা

মহান কবিদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত বলে এই রীতি বেছে নেন। কালিদাস হলেন সুকুমার রীতির কবি। বাণভট্ট-ভবভূতি বিচিত্র কবিস্বভাবের এবং মাতৃগুপ্ত হলেন মধ্যম রীতির কবি।

কুন্তকের বক্রতাকল্পনায় ভাষাতাত্ত্বিক তন্ময় উপাদান থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা ধ্বনি বা রসবাদকে ছাড়িয়ে যায়নি। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ বক্রতাকল্পনায় রসবাদ প্রভাব ফেলেছে। ধ্বনিকে স্বীকার করে, আনন্দবর্ধনের অনেক শ্লোককে নিজের ব্যাখ্যাকর্মে যোগ করে কুন্তক তাঁর বক্রতাধারণাকে প্রকাশ করেছিলেন। কুন্তক অর্থের ব্যাখ্যা দেন এভাবে :

'কবির অভিপ্রেত অর্থের বিশেষভাবে প্রকাশের ক্ষমতাই বাচকত্ব বা শব্দের লক্ষণ।.....পদার্থসমূহ কবিপ্রতিভায় তৎকালোচিত এক বিশেষ পরিস্পন্দ দ্বারা পরিস্ফুরিত হয়। প্রকৃত বস্তুর উপযুক্ত এক বিশেষ উৎকর্ষ দ্বারা তাদের স্ব-ভাব সমাচ্ছাদিত হয়। কবির অভিপ্রায় প্রকাশ করতে পারে বলেই তা অর্থ বলে কথিত হয়।'

কুন্তকের এই অর্থ-ব্যাখ্যানের পাশে তাঁর পানক-রসের উপমাটি মনে পড়ে। 'অর্থের উপলব্ধি হলে পদ ও বাক্যের অর্থ ছড়িয়ে তা সুধীদের মনে পানক-রসের আস্বাদের মতো অনির্বচনীয় কিছুর আস্বাদ দান করে।' অর্থের ক্ষেত্রে 'এক বিশেষ পরিস্পন্দ' আর পানক-রসের অনির্বচনীয়তা রসবাদের কাছে পৌঁছে দেয়। এই একই ঘটনা ঘটেছে ওয়াল্টার পেটারের শৈলী আলোচনায়। পেটারও বলেছেন : '*দা ওয়ান ওয়র্ড ফর দা ওয়ান থিং, দা ওয়ান থট, অ্যামিড দা মালটিচুড অব্ ওয়র্ডস টার্মস দ্যাট মাইট জাস্ট ডু;.....দা ইউনিক ওয়র্ড, ফ্রেজ, সেন্টেন্স, প্যারাগ্রাফ, এসে অর সং অ্যাবসলিউটলি প্রপার টু দা সিংগল মেন্টাল রিপ্রেজেন্টেশান অব্ ভিশন উইদিন' (অ্যাপ্রিশিয়েশনস, পৃ. ১৯)।*

কুন্তক ধ্বনিবাদবিরোধী নন। তাঁর বক্তব্যে রস, স্ব-ভাবের আলোচনা কিংবা আনন্দবর্ধনের ঔচিত্যবাদের ছায়া আছে। ধ্বনিকে চূড়ান্ত অস্বীকার তিনি করতে পারেননি। নায়কের মহত্ত্ব বাড়াতে অক্ষম বিষয়গুলি বর্জন এবং কবির রচনা বস্তু বা কাহিনি দ্বারা সজীব হয় না, রসের নিশ্ছিদ্র প্রবাহ দ্বারা হয়—এমন বক্তব্য রসবাদকে মেনে নেওয়ারই পরিণাম। যদিও কবির ক্ষমতা এবং দক্ষতাকে তিনি মর্যাদাদান করেছিলেন।

কুন্তকের বক্রতা ব্যাপারকে যাঁরা আধুনিক শৈলীচিন্তার সঙ্গে এক করে ফেলেন, তাঁরা একালীন ভাবনাকে সেকালে আরোপ করেন। কুন্তকের বক্রতা-ব্যাপারের সঙ্গে পশ্চিমের প্রথাগত শৈলীচিন্তার আংশিক মিল আছে। রীতিবাদের একালীন ব্যাখ্যা তারা ভুলে যান যে, সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্বে রীতি হল কাব্যের নির্যাসকারী। একটি পুরো ছবি যেমন কয়েকটি রেখায় ফুটে ওঠে, তেমনি কাব্যও রীতি দ্বারা প্রকাশ পায়। ফলে গুণ নিত্য, অলংকার অনিত্য। তবে রীতিবাদের ব্যাকরণঘেঁষা আলোচনা এবং কবিব্যাপারভাবনায় কিছুটা তন্ময় রূপদানের প্রয়াস আছে, একথা অস্বীকার করা যায় না।

১.৩ ❑ শৈলীর সংজ্ঞা ও অস্তিত্ববিচার

শৈলী যদি ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্বের রীতি না হয়, তাহলে শৈলী বলতে কী বোঝায়? শৈলী কি রচনার তন্ময় উপাদান ও লেখকব্যক্তিত্বের সমাহার? এসব প্রশ্ন এবার পশ্চিমী তত্ত্বে দেখা যাক। কেননা এর আগে শৈলীকে প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে পারেনি।

শৈলী শব্দটি প্রায় হাজার বছর ধরে পশ্চিমী আলোচনায় ব্যবহৃত হচ্ছে। অথচ এর দ্বারা কি বোঝানো হয়, তা নিয়ে ওদেশে বিতর্কের অন্ত নেই। সাহিত্যের কিছু পারিভাষিক শব্দ আমাদের প্রিয় হলেও তাকে সংজ্ঞার বাঁধনে বাঁধা এক কঠিন কাজ।

আরিস্টটল তাঁর 'রিটোরিকস'-এর তৃতীয় খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে মুখের ভাষার তিনটি শৈলীভাগ করেছিলেন। এগুলি হল :

১. সমুচ্চ শৈলী (গ্র্যান্ড স্টাইল) : আদালতে জুরিদের সামনে অলংকৃত ভাষণ,

২. মধ্যম শৈলী (মিডল স্টাইল) : জুরিদের বিশ্রামের সময় পারস্পরিক কথাবার্তা,

৩. নিম্ন শৈলী (লো স্টাইল) : সাধারণ স্নানাগারে নাগরিকদের সংলাপ।

আরিস্টটল জানতেন যে, এখানে রচনা নয়, উক্তির ধরন দেখানো হয়েছে। এরা মানুষের বাচিক ব্যবহারের তিনটি খণ্ডাংশ। এরা সমান্তরালভাবে প্রযুক্ত হয়, না মাঝে মাঝে এদের মিল ঘটার সম্ভাবনা থাকে—এই বিষয়ে তিনি 'রিটোরিকস্'-এ নীরব। অথচ তাঁর 'পোয়েটিকস্' বইয়ে এর ব্যাখ্যান আছে।

পোয়েটিকসের উনিশ অধ্যায়ে তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, ওপরের স্টাইল-ধারণা বা উক্তির ধরন অন্য জাতের আলোচনার বিষয় হলেও কাব্যের ভাষার মধ্যে পড়ে না। অক্ষর, সিলেবল, সংযোজক শব্দ, বিশেষ্য, ক্রিয়া, বিভক্তি বা কারক এবং বাক্য ও খণ্ডবাক্যের সামান্য আলোচনা করে তিনি কাব্যভাষার বৈশিষ্ট্য নিরূপণে জোর দিয়েছেন। শব্দের বিভাগ করতে গিয়ে তিনি প্রচল, বিচিত্র বা রূপকায়িত, অলংকৃত, নব-গঠিত, প্রসারিত, সংকুচিত ও পরিবর্তিত ধারণা এনেছেন।

প্রচল বা যথার্থ শব্দ বলতে তিনি জনতার ব্যবহৃত শব্দকে ভেবেছেন। বিচিত্র শব্দ হল অন্য দেশের শব্দ। একটি শব্দ একসঙ্গে প্রচল ও বিচিত্র হতে পারে, কিন্তু একই মানবগোষ্ঠীর মধ্যে নয়। রূপক হল সাদৃশ্য বা জাতি থেকে ব্যক্তি বা ব্যক্তি থেকে জাতিতে অর্থান্তরিত শব্দগুলি। যেমন, 'সন্ধ্যা' হল 'দিনের বৃদ্ধ বয়স'। আবার বার্ধক্য হল 'জীবনের সন্ধ্যা', এমপেডোক্লেসের ভাষায় 'জীবনের অস্তায়মান সূর্য'। শব্দের প্রসারণে স্বরের দীর্ঘায়ন এবং সিলেবলের আগম ঘটে বলে তিনি ভেবেছেন। শব্দসংক্ষেপে এর কোনো অংশ বাদ দেওয়া হয়।

ঐ বইয়ের বাইশতম অধ্যায়ে শৈলীর কথা এসেছে। শৈলীর পূর্ণতা অর্থ ছাড়াই স্পষ্ট হয়। স্বচ্ছতম শৈলীতে প্রচল এবং যথার্থ শব্দেরা স্থান পায়। আবার স্বাভাবিক বাগ্‌ধারা থেকে দূরে সরে গিয়ে অপ্রচল, রূপকায়িত, প্রসারিত শব্দেরা এক অস্বাভাবিক শৈলী গড়ে তোলে। এই শৈলীতে শব্দেরা ধাঁধা কিংবা নিরর্থক বাক্য গড়ে তোলে। রূপকের ফলে আসে ধাঁধা আর অপ্রচল শব্দের ফলে নিরর্থকতা। শৈলীরচনায় এদের সংমিশ্রণ ঘটবে না, এমন নয়। এরা সাধারণ ভাষা থেকে শৈলীকে উন্নত করবে, অর্থগর্ভ করবে। আবার যথার্থ শব্দেরা একে প্রাঞ্জল করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে সাধারণ বাগ্‌ধারা থেকে ভাষা সরে গিয়ে বিশিষ্টতা পাবে, আবার লোকব্যবহারের সঙ্গে আংশিক সংযোগ সুস্পষ্টতা দান করবে। সব কিছুই ব্যবহৃত হবে ঔচিত্যবোধের দ্বারা। রূপকের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ দরকার। তুলনার দৃষ্টিকে সঠিক রেখে প্রতিভাবান ভালো রূপক সৃষ্টি করেন। সমাস ডিথ্রাম্বিক রচনায়, অপ্রচল শব্দ বীরগাথায় এবং রূপক আয়াম্বিক ছন্দে সবচেয়ে সুপ্রযুক্ত হয়। আয়াম্বিক পদ্যে উপযুক্ত শব্দ পরিচিত উক্তি, এমনকি গদ্য থেকেও উঠে আসে। এইসব শব্দেরা প্রচল বা যথার্থ, রূপকায়িত এবং অলংকৃত শব্দ।

আরিস্টটলের এই শৈলীব্যাখানে তাঁর মূল বক্তব্য সংক্ষিপ্ত হলেও ভাবোদ্দীপক। যেমন :

১. প্রতিদিনের ভাষা ও কাব্যভাষার পার্থক্য

২. শৈলীর প্রাণবিন্দু হল প্রাঞ্জলতা

৩. অস্বাভাবিক শৈলী

৪. ঔচিত্যধারণা ও উপযুক্ত শব্দকোষ

জোনাথান সুইফট ইংরেজি সাহিত্যের এক বড়ো শিল্পী। তাঁর এক তরুণ ধর্মযাজক বন্ধুকে লেখা চিঠিতে তিনি শৈলীর সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—'প্রপার ওয়র্ডস ইন প্রপার প্লেসেস, মেকস দা ট্রু ডেফিনিশন অব্ আ স্টাইল (stile)।' উপলক্ষ (কনটেক্সট) নিয়ে আরও ভাবার দরকার, তিনি লিখেছেন। শ্রোতাদের কাছে যাজকের অপ্রচল পরিভাষা ব্যবহারকে তিনি নিন্দা করেছেন। রাজপুত্র বা পার্লামেন্টের আলোচনার ভঙ্গি আর নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষের কাছে বলা সহজ উপদেশের ভঙ্গি এক হয় না। এই অবধি মনে হতে পারে যে সামাজিক পরিস্থিতিতে বাগ্‌বিনিময়ের কথাই তাঁর বলার বিষয়। কিন্তু একই চিঠিতে একটু বাদে তিনি লিখেছেন :

> 'হোয়েন আ ম্যানস থটস আর ক্লিয়ার, দা প্রপারেস্ট ওয়র্ডস্ উইল জেনারালি অফার দেমসেলভস ফার্স্ট; অ্যান্ড হিজ ওন জাজমেন্ট উইল ডাইরেক্ট হিম ইন হোয়াট অর্ডার টু প্লেস দেম, সো অ্যাজ দে মে বি বেস্ট আন্ডারস্টুড।' (নিম্নরেখ শব্দগুলি বড়ো হাতের লেখায় ছিল)

সুইফটের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মূল্যবান কথা জানা যায় :

১. যখন মনের চিন্তা স্বচ্ছ থাকে, তখন যথার্থ শব্দেরা ভাষায় স্থান পায়।

২. লেখক বা বক্তা সচেতন বিচারবুদ্ধিতে এদের সাজান।

৩. তাঁদের লক্ষ্য থাকে শব্দেরা যাতে বক্তা-শ্রোতা-পাঠকের সঙ্গে সংপ্রেষণ (কম্যুনিকেশান) করতে পারে।

আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানও সুইফটের এই ধারণাকে সমর্থন করে। যে-কোনো মানুষের সামনে একই বিষয় প্রকাশের জন্য অনেক শব্দার্থের উপায় থাকে (মাল্‌টিপল চয়েজ অব এক্সপ্রেশনস)। দুজন মানুষ কখনও এক বিষয়ে এক কথা বলে না। এমনকি প্রথমবারে তার বলা বা লেখা দ্বিতীয় বারে পালটে যায়। সুইফ্‌ট প্রথম একটি রচনার সঙ্গে উপলক্ষের সম্পর্ক দেখালেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুসরণ করে আমরা বলতে পারি যে, মানুষ তার সহজাত বিচারশক্তি এবং স্বচ্ছ চিন্তার বলে বিভিন্ন উপলক্ষে আলাদা আলাদা শৈলী ব্যবহার করে থাকে।

আর বুফোঁর প্রদত্ত শৈলীসংজ্ঞাকে সুইফটের পাশে রাখতে পারি। বুফোঁর শৈলীসংজ্ঞা বোধহয় সবচেয়ে প্রচলিত এবং সহজতম। তিনি বলেছিলেন, 'স্টাইল ইজ দা ম্যান হিমসেল্‌ফ।' বাংলা সাহিত্যালোচনায় এর শেষের শব্দটি প্রায়ই অকারণে বাদ দেওয়া হয় (বাহুল্যবর্জন না অজ্ঞানতার জন্য, তা বলা কঠিন)। বুফোঁ শৈলীর সঙ্গে নির্বাচনরীতির সম্পর্ক এবং লেখকব্যক্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন। অথচ কেন এক একটি শৈলী একেক প্রকারের, এ কথার উত্তর তিনি দেননি। একজন লেখক নানা সময়ে নানা শৈলী নিতে পারেন। এমনকি তাঁর একই রচনায় মিশ্র শৈলীও থাকতে পারে। একজন মানুষকে সরলরেখার ঋজুতায় মাপা যায় না। তেমনি

শৈলীও একরৈখিক নয়। বুফোঁর শৈলীধারণার সবচেয়ে বড়ো দিক হল লেখকের ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধান। শৈলী লেখকজীবনের বাস্তবতাকে ঘিরে গড়ে ওঠে।

বুফোঁর শৈলী-আলোচনা অনেককে খুশি করলেও ঔপন্যাসিক গুস্তাভ ফ্লবেয়ার এতে আপত্তি জানিয়েছেন। প্রতিভাবানের জীবনে পরিশ্রম এবং ধৈর্য্যের স্থান নেই বলে বুফোঁ জানিয়েছিলেন। ফ্লবেয়ার সেই অনায়াসলব্ধ প্রতিভাকে ধিক্কার জানিয়ে লিখেছেন :

'হোয়াট বুফোঁ সেইড্ ইজ আ বিগ ব্লাসফেমি : জিনিয়াস ইজ নট লং-কন্টিনিউড পেসেন্স।'

তিনি লেখকের কঠোর সাধনাকে এভাবে ভেবেছেন :

'সিক', ইরিটেটেড দা প্রে আ থাউজেন্ড টাইমস আ ডে অব ক্রুয়েল পেইন, আই কন্ডিনিউ মাই লেবর লাইক আ ট্রু ওয়ার্কিং ম্যান, উইথ শ্লীভস টার্নড আপ ইন দা সোয়েট অব্ হিজ ব্রাউ, হিটস্ অ্যাওয়ে অ্যাট হিজ এনভিল, নেভার ট্রাবলিং হিমসেলফ হোয়েদার ইট রেইনস অর ব্লোজ, ফর হেইল অর থান্ডার।'

ফ্লবেয়ার প্রকাশকৌশলের চরমতা ও অনন্যতাকে শৈলী ভেবেছেন। তাঁর কাছে প্রকরণ ছিল কৃতির নামান্তর। শৈলী যদি হয় মানুষেরই স্ব-প্রকাশ, তবে সমস্ত রঙ্ ও অনুভবের গভীরতা-বৈচিত্র্য নিয়ে প্রকৃত অর্থে তা নৈর্ব্যক্তিক (ইম্পার্সোন্যাল), এটা মনে রাখা প্রয়োজন।

ইংরাজ সমালোচক-প্রাবন্ধিক ওয়াল্টার পেটার আদর্শ সৌন্দর্য ও প্রকরণের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তাঁর 'অ্যাপ্রিশিয়েশনস্' বইয়ে পরে শৈলী নিয়ে একটি নিবন্ধ যুক্ত হয়। সাহিত্য-শিল্পের কথায় পেটার প্রয়োজনের শিল্পের (সার্ভিসেবল আর্ট) সঙ্গে সৌন্দর্যের পার্থক্য টেনেছেন। তাঁর ভাষায় :

'লিটারারি আর্ট, দ্যাট ইজ, লাইক অল আর্ট ইজ ইন এনি ওয়ে ইমিটেটিভ অর্ রিপ্রোডাক্টিভ অব্ ফ্যাক্ট—ফর্ম, অর্ কলার, অর্ ইনসিডেন্ট—ইজ দা রিপ্রেজেন্টেশান অব সাচ ফ্যাক্ট অ্যাজ কানেক্টেড উইথ সোল, অব্ আ স্পেশিফিক পার্সোন্যালিটি, ইন ইটস প্রেফারেন্স, ইটস্ ভলিশন অ্যান্ড পাওয়ার।'

('অ্যাপ্রিশিয়েশনস্', পৃ. ৫)

তাই লেখকের চেয়ে তার তথ্যের অনুভূতি কাম্য এবং রমণীয় হয়ে ওঠে। সাহিত্যিককে বিদগ্ধ হতে হবে। তাঁর বৈদগ্ধ্য বিদগ্ধ বিবেকের উপর নির্ভর করে। বৈদগ্ধ্যের এক বিশেষ ব্যাখ্যা পেটার দিয়েছেন। ভাষার নিজস্ব বর্জন (এলিমিনেশন) এবং অগ্রাধিকার-নিয়ম (ল অব্ প্রেফারেন্স) সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক সারভূত উপলব্ধি হল বৈদগ্ধ্য। লেখক যে উপকরণ ও মাধ্যম নিয়ে সৃষ্টিকর্ম করবেন, তার স্বাভাবিক বর্জনের প্রকৃতিতে শিল্প সংহত হয়। সংক্ষিপ্তি, অতিশয়িত বিশদতা (এক্সাজারেটেড ডিটেইলিং) কিংবা অশিক্ষিতদের জন্য অতিসরলীকরণে তিনি মনোযোগী হবেন না। নিজস্ব পদ্ধতিতে তিনি শব্দভাণ্ডার সাজাবেন। নিজের ভাষাবোধের দ্বারা তিনি শব্দচয়ন করবেন, পণ্ডিতের মতো নয়। শিলার তাই বলেছিলেন, 'শিল্পীকে তার বর্জনকৌশলেই জানা যায়।' সাহিত্যিক স্থাপত্যকর্মে দূরদৃষ্টি থাকবে সূচনায়। আবার সৃষ্টিকালে ছাঁদ (প্যাটার্ন) বিস্তৃত হবে। সমস্ত অস্বাভাবিকতা, আকস্মিক চমক এবং পশ্চাৎচিন্তা একটা সমগ্রবোধের অধীনে থাকবে। সংযতভাবে সৃষ্টির অনুপ্রেরণাকে প্রতি স্তরে এমনভাবে তিনি বিন্যাস করবেন যাতে পাঠকমনে স্বাভাবিক প্রগতিবোধ (সেন্স অব্ (প্রোগ্রেশন) জেগে ওঠে। সৃষ্টিশীল এষণা হল কল্পনারই একটি রূপ।

পেটারের শৈলীব্যাখ্যানের মধ্যে অবয়ববাদী (স্ট্রাকচারালিস্ট) দৃষ্টিভঙ্গি কিছুটা সক্রিয় হয়েছে। পেটারের কিছু মন্তব্য নির্দেশমূলক (প্রেশক্রিপ্‌টিভ) হলেও রচনার প্রকরণ সম্পর্কে ভাবনার পরিচায়ক। কিন্তু একতম মান্য শব্দের উপলব্ধি ভাববাদের ইঙ্গিত দেয়। তিনি বুফোঁর সংজ্ঞাকে আরেকটু যুক্তিশাসিত করে জানালেন :

'দা স্টাইল, দা ম্যানার, উড বি দা ম্যান, নট ইন হিজ আনরিজনজ অ্যান্ড রিয়ালি আনক্যারাক্টারিস্টিক ক্যাপ্রিসেজ, ইনভলান্টারি অর্ এফেক্টেড, বাট ইন অ্যাবসলিউটলি সিনসিয়ার অ্যাপ্রিহেনশন অব্ হোয়াট ইজ মোস্ট রিয়াল টু হিম।'

(অ্যাপ্রিশিয়েশনস্ পৃ. ২৪)

শৈলী তাই ব্যক্তিত্বের শিকড় থেকে উঠে এলেও শেষাবধি ব্যক্তিক নয়।

মিডলটন মারী আলাদাভাবে শৈলীকে দেখেছেন। মারীর অনুসরণে তিনটি বাংলা বাক্য নেওয়া যাক যাতে তাঁর শৈলীধারণার আভাস দেওয়া যায়।

১. বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত লেখকনামহীন রচনাটির শৈলী দেখে মনে হয়, এটি বঙ্কিমেরই রচনা।

২. ওঁর বিষয় নূতন হলেও লেখার কোনো শৈলী নেই।

৩. সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে পদান্বয় দুরূহ, অপ্রচল তৎসম শব্দও কম নেই। তবু স্বীকার করতে হবে তাঁর শৈলী আছে।

প্রথম বাক্যে 'শৈলী' বলতে লেখকের প্রকাশস্বাতন্ত্র্য (ইডিওসিনক্রেসি অব্ এক্সপ্রেশন) বোঝানো হয়েছে। বাগ্‌বিন্যাস এবং জীবনদৃষ্টিতে তার পার্থক্য ধরা পড়ে। একজন মানুষকে যেমন তার কিছু বিশেষত্বের জন্য আরেকজন থেকে আলাদা করা যায়, তেমনি একজনের শৈলী অপরের থেকে পৃথক।

দ্বিতীয় বাক্যে শৈলী এসেছে প্রকাশকৌশল (টেকনিক অব্ এক্সপ্রেশন) রূপে। নূতন ভাবনা থাকলেও ভাবনা-পরম্পরার সহজ সম্পর্ক, প্রকাশের স্বচ্ছতা, সংপ্রেষণের ক্ষমতা না থাকায় সেখানে শৈলীর চিহ্ন চোখে পড়ে না। গদ্যের গঠন সম্পর্কে উদাসীনতা কিংবা সংপ্রেষণহীনতার জন্য এই লেখক শৈলীহীন।

তৃতীয় বাক্যে শৈলী চূড়ান্ত অর্থে (স্টাইন ইন অ্যাবসলিউট সেন্স) এসেছে। সর্বজনীন ধারণাকে ব্যক্তিক এবং বিশেষীকৃতভাবে প্রকাশ করাকেই শৈলী বলা হয়েছে।

শৈলীর এই তিন ধ্বনের বিভাগ সমালোচনার কাজকে জটিল করে। সমালোচক কখন কোন্ সংজ্ঞা ভেবে আলোচনা করছেন, তা পাঠকের কাছে স্পষ্ট থাকে না। মারীও শৈলীর একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন :

'স্টাইল ইজ আ কোয়ালিটি অব্ ল্যাংগুয়েজ হুইচ কমিউনিকেটস প্রিসাইজলি ইমোশনস অর্ থটস্, অর্ আ সিস্টেম অব ইমোশনস অ্যান্ড থটস্, পিক্যুলার টু দা অথর।'[২]

(দা প্রব্লেম অব স্টাইল, পৃ. ৬৫)

পেটারের কবিদৃষ্টির মতনই মারীর রোমান্টিকতা শৈলীর সংজ্ঞাদানকে শেষ পর্যন্ত আবেগমুক্ত করতে পারেনি। মারীর এই সংজ্ঞার পাশে আরও মন্ময় ও আবেগী (ইমোশন্যাল) সংজ্ঞার কথা পাঠকের মনে পড়তে পারে। এইসব উদাহরণে সংজ্ঞার ভাষা মোহিনী হলেও ধারণার শিথিলতা সেখানে গোপনে সক্রিয় থাকে।

শৈলীর পশ্চিমী ব্যাখ্যানে সুইফট আর বুফোঁ ভিন্নপথগামী। একজন লেখকের বিশেষ শব্দচয়ন-বুনোটের ব্যাখ্যা করে তা চিহ্নিত করা শব্দ-সংখ্যা-তাত্ত্বিকের (লেক্সিকো-স্ট্যাটিসসিয়ান) কাজ। এঁদের পুরোগামী হলেন বুফোঁ। আবার শৈলীর সামাজিক ব্যাখ্যাতাদের অগ্রগামী ছিলেন জোনাথান সুইফ্‌ট। প্রথম পদ্ধতি যদি হয় বর্ণনাত্মক (ডেসক্রিপটিভ), দ্বিতীয় পদ্ধতি তাহলে ব্যাখ্যানমূলক (এক্সপ্লেনেটরী)।

আরিস্টটল থেকে মারী পর্যন্ত কোনো সমালোচক শৈলী নিয়ে শেষ কথা বলেননি। এইসব সংজ্ঞায় কিছু সত্য ও যুক্তি আছে। কিন্তু সেগুলি ধ্রুব এবং একার্থক নয়। সমালোচক স্থির সংজ্ঞার জন্য ব্যস্ত হন। সৃষ্টির রাজত্বকে শাসনের মোহে; সাহিত্যিক পরিভাষার অর্থ খুঁজতে গিয়ে তিনি বিশৃঙ্খলার জগতে পৌঁছান। আর আমরা পড়ুয়া ও পণ্ডিতেরা বিপন্ন বিস্ময় অনুভব করি।

বেনিসন গ্রে তাঁর 'স্টাইল : দা প্রব্লেম অ্যান্ড ইট্‌স সল্যুশনস' রচনায় এই সমস্যা থেকে অন্যভাবে মুক্তি খুঁজেছেন। তিনি মনে করেন, শৈলী বলে কিছু নেই। শৈলী হল উলঙ্গ রাজার অদৃশ্য পোশাকের মতো যা 'সত্যই অতীব সূক্ষ্ম, চোখে/পড়ছে না যদিও, তবু আছে,/অন্তত থাকাটা কিছু অসম্ভব নয়' (উলঙ্গ রাজা, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী)। কিংবা তা হল প্রাচীন পদার্থবিদ্যার ঈথারের মতো একটা মাধ্যম (পদার্থ নয়) যা শূন্যতাকে ভরাট করে রাখে এবং তড়িৎ-চুম্বকস্রোত পাঠায়। ঈথারের শব্দমূলে গ্রীক 'aither' আছে। তার মানে স্বর্গ যা মানুষের কল্পনায় আছে, প্রত্যক্ষ দেখায় নেই।

তাহলে শৈলী আছে কেন মনে করা হয়? কারণ, বেশিরভাগ মানুষ একে দেখতে চান। আবার সৃষ্টির বহু রহস্যকে সহজ, সর্বমান্য শৈলীর আড়ালে লুকোনো যায় বলে এর অস্তিত্বের ধারণা সক্রিয়। তিনি (গ্রে) মনে করেন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আসলে শৈলীর বস্তু নয়। ভাষা, বিষয়, উপলক্ষ এবং পরোক্ষ উল্লেখকর্ম (ইনডিরেক্ট রেফারেন্স) শৈলীর উপাদান। সুইফ্‌টের মতো শৈলীকে নির্বাচনের রকমফের বলতেও তিনি চান না। কেননা লেখকের মনের কর্মশালার সবটুকু আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর নয়। গ্রে-র বক্তব্য হল :

> *'ইন এভরি কেস অব্ দা ইউজ অব্ দা ওয়র্ড 'স্টাইল'.....দা ইউজার হ্যাজ ফাউন্ড ইট নেসেসারি টু গো আউটসাইড দা ওয়র্ক টু এস্টাব্লিশ দা এগজিসটেন্স অব স্টাইল, অ্যান্ড ইন এভরি কেস হি হ্যাজ হ্যাড টু গো সামথিং ফর হুইচ দেয়ার এগজিস্টস নো এভিডেন্স বাট দা পার্টিকুলার ওয়র্ক হুজ স্টাইল হি উইশেস টু ডিসকাস।'*
>
> [গ্রে (১৯৬৯), পৃ. ১০৭)]

বেনিসন গ্রে একজন গোঁড়া ঐক্যবাদী (অর্গানিস্ট)। তাঁর কাছে সাহিত্যকৃতি এক এবং অবিভাজ্য। প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, শৈলী ও প্রকাশকৌশল, পদ্ধতি ও ফলাফলের মধ্যে কোনো বিরোধিতা নেই। শুধু গ্রে কেন, কোনো আলোচকই শৈলীর কথায় উপসংহারে পৌঁছতে পারেননি।

শৈলীর একটা সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা আমাদের সাহিত্যালোচনায় বিশেষ প্রয়োজন। অথচ দু-চার কথায় তাকে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। এই সমস্যা আমাদের বিজ্ঞানের ইতিহাসে পৌঁছে দেয়। বিজ্ঞানের দার্শনিকরা সংজ্ঞার দুটি বিভাগ করেছে—১. বিষয়ী (সাবস্ট্যানটিভ্), ২. অঙ্কপাতনিক (নোটেশনাল)। আইডিয়ার বিরাট বদল না হলে বিষয়ী সংজ্ঞা পাল্‌টায় না। আংকপাতনিক সংজ্ঞায় সংক্ষিপ্তি, সংহত প্রকাশই মূল কথা। এ অবধি পাওয়া শৈলীর সংজ্ঞাগুলি সবই অঙ্কপাতনিক। য়ুরোপীয় লেখকরা শৈলীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সর্বত্রই ভাষার জয়ধ্বনি করেছেন।

শৈলী অঙ্কপাতনিক বা বিষয়ী যাই হোক না কেন, তাকে সমালোচনায় নিষেধের তর্জনী দেখাতে পারি না। এমনকি একে অবাঞ্ছিত বলে ফতোয়া দেওয়া যায় না। ঐক্যবাদে অর্থ ও নান্দনিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে রচনার অখণ্ড সমগ্র রূপ ভাবা হয়, সেখানে শৈলীও বাদ পড়ে না।

বেশ কিছুদিন হল পাশ্চাত্যে শৈলীবিজ্ঞান (স্টাইলিস্টিক্স্) বলে এক সমালোচনাশাস্ত্র গড়ে উঠেছে। কৃতি বিশ্লেষণ করে, নানা পদ্ধতিতে তার ভাষিক উপাদানকে চিহ্নিত করে সমস্ত রচনার ফল এবং ব্যক্তি-অনুভবের সমবায়কে প্রতিক্রিয়ার কারণরূপে খোঁজা এক উঁচু দরের বৈধ সমালোচনা পদ্ধতি। শৈলীর জনপ্রিয় (পপুলার) সংজ্ঞাদান কঠিন কাজ হলেও কোনো বিশেষ পদ্ধতির এ জাতীয় প্রয়োগ সমালোচনার ইতিহাসে এক নূতন শাস্ত্রের সূচনা করেছে। একে বলতে পারি স্টাইলিস্টিক্স্ বা শৈলীবিজ্ঞান।

শৈলীবিজ্ঞানের বয়স বেশি না হলেও এর উৎসমূলে ভসলার-ক্রোচে-স্পিৎজারের চক্রতত্ত্ব, রাশিয়ান ফর্মালিজম, অবয়ববাদ, নব্য-অবয়ববাদ (নিওক্রিটিসিজম বা নিওস্ট্রাকচারালিজম), প্রাগ্ গোষ্ঠীর অবয়ববাদ, ভাষাবিজ্ঞানের নানা মহল সক্রিয় ছিল। এসব আলোচনা করে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের নানা মহলে পৌঁছতে পারি।

১.৪ ❑ ভসলারস, ক্রোচে, স্পিৎজার : কৃতি ব্যাখ্যান

ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার প্রমুখ ভাববাদীরা ভাষাবরণের অন্দরমহলে প্রবেশের জন্য বিভিন্ন উপায় বা পথ খুঁজেছিলেন। ভসলার ভাষার বিশদতার আড়ালে জাতীয় সংস্কৃতির সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত ছিলেন। ক্রোচে ভাষাকে সৃষ্টি বলে মনে করে একে নন্দনতত্ত্বের শাখা মনে করেছেন। বেনেদিত্তো ক্রোচের 'ঈসথেটিক' বইয়ে তাঁর বিশেষ ভাবনার পরিচয় পাই :

> *'দা ইনট্যুশন অ্যান্ড এক্সপ্রেশন টুগেদার অব্ আ পেইন্টার আর পিকটোরিয়াল; দোজ অব্ আ পোয়েট আর ভার্বাল, বাট বি ইট পিক্টোরিয়াল, অর ভার্বাল, অর মিউজিক্যাল ক্যান এক্সপ্রেশন বি ওয়ান্টিং বিকজ ইট ইজ অ্যান ইনসেপারেবল পার্ট অব ইনট্যুশন।'*

এই নিষ্পন্ন হওয়ার সূত্রকে আরও ব্যাখ্যা করে ক্রোচে লিখেছেন অলংকার ও প্রকাশকৌশলের সম্পর্কের কথা।

একালে লিও স্পিৎজারও অনেক কৃতির তুলনামূলক আলোচনায় সংস্কৃতি ও প্রকাশভঙ্গির সম্পর্ক দেখিয়েছেন। তিনি বলতে চান যে, ধাপে ধাপে না এগিয়ে গোড়াতেই লেখকের ব্যক্তিত্বলক্ষণ দেখা দরকার। এই লক্ষণ লেখকের অন্য রচনাতেও দেখতে হবে। যদি তা পাওয়া যায়, তবে সন্ধান সার্থক হবে। আর তা না পেলে অন্য লক্ষণে মনোযোগ দিতে হবে। এই হল স্পিট্জারের চক্রধারণা (স্পিট্জারিয়ান সার্কেল)। স্বজ্ঞা বা উপলব্ধির দ্বারা শৈলীবৈজ্ঞানিক ধারণা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা স্পিৎজার করেছিলেন। কিন্তু স্পিৎজারীয় অন্তর্দৃষ্টি সাধারণ আলোচকরা কোথায় পাবেন? তাই এর চেয়ে স্থূল, বহিরঙ্গ পদ্ধতি তাঁদের কাছে কাম্য হয়ে দাঁড়ায়।

ভসলার, ক্রোচে, স্পিৎজার—সকলেই এক বড়ো পরিপ্রেক্ষিতে শৈলীসন্ধান করেছিলেন। এই পরিপ্রেক্ষিত হল সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিত। এদের তত্ত্বানুসন্ধানের কাল ও পরিবেশ বিচার করলে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদের

এক আদর্শবাদী বহিরাবরণ এদের সংস্কৃতি সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিল। আবার সংস্কৃতিসূত্রে আসা জৈবিক ঐক্যের ধ্রুপদি অস্পষ্ট ধারণাটি এদের মনে আদর্শবাদের বীজ বুনেছিল। ফলে স্বজ্ঞা বা উপলব্ধির মন্ময়তার দিকে এরা গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। এদের সৌন্দর্যতত্ত্ব ও প্রকাশব্যাখ্যান আমাদের রসতত্ত্বের মায়াবাদের মতো। এই তত্ত্ব আলেয়ার মতো বিশ্লেষণের পথ থেকে আমাদের সরিয়ে আনে।

১.৫ ❑ রাশিয়ান ফর্মালিজম্

ক্লদ লেভি-স্ট্রোস একটি প্রবন্ধে (১৯৬৪) মন্তব্য করেছিলেন যে, 'একবিংশ শতক হয় সামাজিক বিজ্ঞানের যুগ হবে অথবা কিছুই হয়ে উঠবে না।' সাহিত্যালোচনাকে বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্তিগুণের অধিকারী করে তোলার এই স্বপ্ন ১৯২০ নাগাদ রাশিয়ান ফর্মালিস্টদের মনেও জেগেছিল। স্বপ্নকামনা ভালো। আমরা (সচেতন আলোচকরা) অনুমান, মন্ময়তা, ব্যক্তিগত পক্ষপাত আর ছদ্ম-বিজ্ঞাননির্ভর রচনায় ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। কীভাবে সেই মর্মজ্ঞান লাভ করব, সেই প্রশ্ন মনে জেগে ওঠে।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, সামাজিক বিজ্ঞানকে যথার্থ করতে গেলে আঙ্কিক নির্ভুলতা দরকার। অঙ্ক এবং সংখ্যাতত্ত্ব আমাদের মর্মজ্ঞানের অন্দরমহলে ছাড়পত্র দেবে। এই 'যথার্থ সত্য' ধারণা পূর্ণ সত্যের আংশিক উদ্ভাসন ঘটালেও এই পথে পথিকের সংখ্যা কম নয়।

অনুবাদ কম হলেও রাশিয়ান ফর্মালিজমের কথা আমাদের হাতে ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে। বাংলায় শৈলী আলোচনায় এই মতবাদকে ভুলে গিয়ে সকলেই অবয়ববাদ (স্ট্রাকচারালিজম), নব্য-অবয়ববাদ প্রসঙ্গ তুলেছেন। ফলে আমাদের আলোচনায় একটা কালপরম্পরার শূন্যতা তৈরি হয়েছে। এই পর্ব বাদ দিয়ে অবয়ববাদে যাওয়া অসম্ভব। বাংলায় রাশিয়ান ফর্মালিজম নিয়ে বিস্ময়কর নীরবতা সাম্যবাদী দেশ ও রচনা সম্পর্কে বিদ্বেষভাবনাজাত কিনা, তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

বিশের দশকে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপোয়াজ IPOYAZ (দা সোসাইটি ফর দা স্টাডি অব্ পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ) এক তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে। প্রতীকবাদের ধর্মীয় ও দার্শনিক ব্যাখ্যায় ফর্মালিস্টদের উৎসাহ ছিল না। কেননা এই প্রতীকবাদের শিকড় নানা অপব্যাখ্যান এবং জটিলতার জন্য ক্রমে দূষিত হয়ে উঠছিল। আন্দ্রে বেলির কাছে সৌন্দর্যতত্ত্ব ও যথার্থ বিজ্ঞানের মর্মজ্ঞান শিল্পের নিরাকরণের উপর নির্ভর করে, এমন মনে হয়েছিল। বিষয়মুক্ত শিল্পপ্রকরণের মধ্যে সত্যকারের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। রুদলফ স্টাইনারের আধ্যাত্মিক সংগতিধারণাকে তিনি অঙ্কশাস্ত্রের আড়ালে আক্রমণ করলেন।

রোমান য়াকোবসন পঞ্চাশ বছর পরে রাশিয়ান ফর্মালিজমকে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন, '১৯২০-এর রাশিয়ান ফর্মালিজম হল অবয়ববাদের শিশুসুলভ বিশৃঙ্খলা'। এই য়াকোবসনই ওপোয়াজের সদস্যরূপে একসময় লিখেছিলেন :

> *'একজন ভাষা বা শিল্পের ক্ষেত্রে কাজ করবে, অথচ অবয়ববাদী ধারণা বুঝবে না—তা কেমন করে হয় আমি বুঝি না। যারা অন্যরকমে আলোচনা করে, তারা অবৈজ্ঞানিক অলস আলাপনে নিজেদের ব্যস্ত রাখে।'*

য়াকোবসনের মোহভঙ্গ ঘটেছিল। হয়তো আরও অনেকের সত্যদর্শন ঘটেছিল। কিন্তু অবয়ববাদের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে যে, রাশিয়ান ফর্মালিজমের তাত্ত্বিক সম্পদ সাহিত্যিক অবয়ববাদের উৎসমুখ।

ওপোয়াজের সভ্যরা বেলি, বেলিনস্কি, দব্রুল্যুবভ সবাইকে অস্বীকার করলেন। প্রতীকবাদ, আদর্শবাদ, মন্ময়ধারণা এবং মনস্তাত্ত্বিক সৌন্দর্যধারণার বিরোধী ওপোয়াজের মূলমন্ত্র ছিল—'প্রতীকবাদের ক্রমবর্ধমান দার্শনিক ও ধর্মীয় প্রবণতার শৃঙ্খল ভেঙে শব্দকে মুক্তিদান করা' (আইখেনবাউম)।

তাহলে ফর্মালিস্টরা কি এক নৈর্ব্যক্তিক সমালোচনার জগৎ তৈরি করলেন? নৈর্ব্যক্তিকতার সন্ধান তাঁরা পেলেও শব্দার্থের মূল্যবান সম্পদ তাঁরা হারালেন। 'সংখ্যাতত্ত্ব এবং অঙ্কশাস্ত্র জগতের সমস্ত উপাদানের একমাত্র ব্যাখ্যাপত্র' বলে তাঁরা ঘোষণা করলেন। ব্যঞ্জনবর্ণের সংস্থানের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সেই মুক্তির উপায় এল।

মরোজভ 'স্টাইলোমেট্রিক' রীতিতে শিল্পে কুন্তীলকবৃত্তি এবং মৌলিকতা আবিষ্কার করলেন। মরোজভ সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে শিল্পশৈলীর বিচার করেছিলেন। কিন্তু এভাবে অগ্রজদের অমান্য করতে গিয়ে নিজেরাও স্বতোবিরোধিতায় ভুগলেন। শব্দকে অর্থের বাঁধনমুক্ত করার ইচ্ছা তাঁদের জেগেছিল। তাঁদের কাছে সাহিত্যগবেষণা হল কৌশলের (ডিভাইস) বিশ্লেষণ। একটি সাহিত্য-কৃতিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ, নিরর্থক বাক্‌ক্রীড়ারূপ দেখা হল। তাঁরা বললেন, 'শিল্পের সঙ্গে জীবন, স্বভাব বা মনস্তত্ত্ব কোনো যুক্তির শৃঙ্খলে বাঁধা নেই' কিংবা 'কবিতার ইতিহাস হল বাচিকভাবে গঠিত কৌশলের ইতিহাস।'

এই আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মীরা য়াকোবসনের মতো পরে নিজেদের ভ্রান্তির দর্শনকে বুঝতে পেরেছিলেন। ভিক্টর শ্‌কোলোভস্কি তাঁর 'বোস্ট্রীং' বইয়ে লিখেছেন—

> *'যখন আমরা শিল্প থেকে অনুভূতি বা আদর্শবাদকে বাদ দিই, তখন ভাবময় অভিজ্ঞতায় পাওয়া প্রকরণের প্রাঞ্জলতা এবং আশঙ্কার জগৎকেই বাদ দিয়ে ফেলি।'*
>
> [বোস্ট্রীং (১৯৭০), পৃ. ১২]

ফর্মালিজমের মূল কথা শিল্পের অচিরস্থায়িত্ব। অঙ্ক ও সংখ্যাতত্ত্ব দ্বারা সাহিত্যবিশ্লেষণ বুদ্ধির ব্যায়ামরূপে চিহ্নিত হয়ে রইল। প্রকরণকে চূড়ান্ত বলতে গিয়ে, বিষয়-ইতিহাস-মানবীয় জ্ঞানের জগৎকে অস্বীকার করতে গিয়ে তাঁরা নিরাকার শব্দের কঙ্কালে পৌঁছলেন। পুশকিন একটি কবিতার এই অবস্থাকে এভাবে কাব্যরূপ দিয়েছেন—

'মিউজিক আই,
ডিসেক্টেড লাইক আ কর্পস।
প্রুভড ইটস হার্মনিজ বাই ম্যাথমেটিকস্।'

এদের সমালোচনা প্রজ্ঞার অভাবে লক্ষ্যহীন হয়েছিল। জীবনানন্দের লেখা আধুনিক মানুষের ভাষাব্যবহারের কৃত্রিমতার প্রসঙ্গ এখানে ব্যাপারটিকে আরও স্পষ্ট করে—

'মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া; বিশেষণ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।'

(১৯৪৬-৪৭, জীবনানন্দ দাস, বেলা-অবেলা-কালবেলা)

ফর্মালিস্টদের এই অতিরিক্ত প্রকরণচেতনার মূলে সেকালের রুশ সাহিত্যচর্চার প্রতিক্রিয়া দায়ী ছিল। সে সময়ে রুশ সাহিত্যচর্চায় জটিল এবং দুর্বোধ্য রচনার পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিল। আন্দ্রে বেলির পথে ইভেগনি জাম্যাটিন, বোরিস পিলজ্যাক 'স্কাজ (skaz)'[৩] ভাবনার সঞ্চার করেছিলেন। অপ্রচল শব্দ, আঞ্চলিক ও প্রাচীন বিন্যাসকলার মোহজাত এক ছদ্ম-রোমান্টিক বিশৃঙ্খলা এবং ইমপ্রেশনিজমের আবহাওয়া গড়ে উঠেছিল। এই বিশৃঙ্খলার হাত এড়াতে, মোহাবরণ ভাঙতে ফর্মালিস্টরা যে পথ বাছলেন, তা সঠিক নয়। কিন্তু ঐ সময় এর বেশি আশা করা কঠিন ছিল।

রাশিয়ান ফর্মালিস্টরা শৈলী ও বিষয়ের সম্পর্ক এবং আদর্শ ভাষাধারণা (নর্ম) থেকে বিচ্যুতির (ডেভিয়েশন) উপর মন্তব্য করেছেন। এদের লক্ষ ছিল শিল্পদক্ষতার পরিকল্পনার প্রতি, বিষয়ের প্রতি নয়। সাহিত্যপাঠকের মনে 'কি'-এর বদলে 'কি করে' সঞ্চারিত করা হল। ফর্মালিজম কয়েকজন ব্যক্তির সমবায়ে গড়ে উঠলেও সকলে শৈলীর বহিরঙ্গ প্রকাশে মনোযোগ দিয়েছেন। রোমান য়াকোবসন সাহিত্যিক ও রূপক-নির্ভর গদ্যের পার্থক্য দেখিয়েছেন। তিনজানভ কবিতার বিভিন্ন ভাগের সঙ্গে সেই স্তরের সংলাপের বৈসাদৃশ্য দেখিয়েছেন। জারমুনস্কি ও আইখেনবাউম রচনার বিষয়কেও শৈলীর আলোচনার অন্তর্গত করেছেন। ১৯৩০ নাগাদ যখন তলস্তয়, ফেদিন এবং ওলগা ফর্মের লেখা 'আমরা কেমন করে লিখি' ('হাউ উই রাইট') প্রকাশিত হল, তখন ফর্মালিজমের গতিবেগ অনেকটাই কমেছে। য়াকোবসনের মতো ভিনোগ্রাদফও ফর্মালিজম থেকে সরে এসেছিলেন। মার্ক্সীয় প্রত্যয় থেকে তিনি সাহিত্যকৃতিকে দ্বান্দ্বিক সমাবেশের উপায়রূপে দেখার প্রস্তাব দিলেন। ভাব, বিষয় এবং সাহিত্য-অবয়ব একটি কৃতির ভাষাতলের নির্মাণকর্মে ক্রিয়াশীল শক্তি। তাই ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর শৈলীবিজ্ঞান (লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিক্স্) মূল শৈলীবিজ্ঞানের একটি অংশ। তা সাহিত্যসমালোচনা ও ভাষাবিজ্ঞানের উপশাখা নয়। একটি কৃতির অবয়বী গুরুত্বদানের এই ফর্মালিস্ট প্রয়াস থেকে এ যুগের অবয়ববাদের যাত্রা শুরু হল।

১.৬ ❑ সাহিত্যিক অবয়ববাদ

সাহিত্যিক অবয়ববাদ আলোচনার আগে অবয়ববাদের সামান্য কথা জানা দরকার। পশ্চিমী দেশে এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি থাকলেও বাংলায় এ বিষয়ে সামান্য আলোচনাই হয়েছে। অথচ এ যুগের বিখ্যাত তত্ত্বগুলির মধ্যে অবয়ববাদের স্থান রয়েছে।

অবয়ববাদকে একটি পদ্ধতি হিসাবে আনেকেই মানতে চান না। তাঁদের কাছে এটি হল জগৎ ও জীবনকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি। এই মত অনুসারে অবয়ববাদে একটি রচনাকর্মের নির্বস্তুক সম্পর্কগুলির একটি রীতি আছে। অবয়ব বা স্ট্রাকচার কোনো বিষয় বা বস্তুর সামগ্রিক গঠন বোঝায়। বিচ্ছিন্ন ঘটনা, বস্তু, ধারণা নয়—সবকিছুর পারস্পরিক সম্পর্কনির্ণয় অবয়ববাদের লক্ষ্য। অবয়ব-উপাদানগুলির বিন্যাস-শৃঙ্খলা

থাকে। এই শৃঙ্খলা অচল বা স্থাণু নয়। গতি এবং রূপান্তর হল অবয়বের ধর্ম। অবয়বের আপন নিয়মেই এই পরিবর্তন ঘটে। সেজন্য অবয়বকে ব্যাখ্যার জন্য এর বাইরে যাবার দরকার নেই।

সমগ্রতা (টোটালিটি), অভ্যন্তরীণ বিন্যাস-শৃঙ্খলা (ইন্টার্নাল কম্বিনেশন চেইন), গতিশীলতা (মোবিলিটি) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণতা (সেল্‌ফ সাফিসিয়েন্সি)—এই নিয়ে হল অবয়বধারণা (স্ট্রাকচারালিজ্‌ম)। এই বিশেষ জ্ঞান সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব শাখাতেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। অন্যদিকে ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর অবয়ববাদে সংকীর্ণ অর্থে অবয়ব খোঁজা হয়। যেমন, ফার্দিনান্দ দা সোস্যুর ভাষার বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ধারণা এনে অবয়ববাদের প্রয়োগ করলেন। দা সোস্যুর ভাষাবিজ্ঞানকে চিহ্নবিজ্ঞানের (সেমিওলজি) অন্তর্গত মনে করলেন। নৃতত্ত্বে লেভি-স্ট্রোস দেখালেন যে, মানুষের সামাজিক আচরণ ভাষার মতো সুনির্দিষ্ট এবং অবয়ব-নির্ভর। উপজাতি সমাজে আত্মীয়তা সূত্র ভাষার ন্যায় ক্রিয়াশীল। মানুষের 'মাইথোলজি' যদি অবয়বী পদ্ধতিতে সাজানো যায়, তাহলে গল্পের বিন্যাস ছাড়াও বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্ক ব্যাকরণের মতো সাজানো যাবে। এই সম্পর্কের বিন্যাস কাল-নিরপেক্ষ এবং সমলয়-নির্ভর (সিনক্রনিক)। মীথের অবয়বকে লেভি-স্ট্রোস শেষাবধি যুগ্ম বৈপরীত্য রূপে (বাইনারি অপোজিশন) দেখেছেন।

ভাষাবিজ্ঞানের মহল থেকে শুরু করে নৃতত্ত্ব অবধি নানা বিষয়কে স্পর্শ করে অবয়ববাদ সাহিত্যালোচনায়ও গভীর প্রভাব ফেলেছে। ভাষার ব্যাকরণের মতো গল্পেরও ব্যাকরণ আছে বলে ধরা হয়। কবিতার বিভিন্ন আলোচনায় ধ্বনি, অর্থ, ব্যাকরণের জটিল বিন্যাসকে অবয়ববাদী দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে। এসব দেখার মূলে আছে একটি নান্দনিক বোধ—এক বিশেষ জাতের কলাকৈবল্য, সাহিত্যকে আলাদা চিহ্নপদ্ধতিরূপে (সেমিওটিক্‌স্) দেখে তার নিজস্বতা ও স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা।

অবয়ববাদীর এই চিন্তার সঙ্গে নৈয়ায়িক ধ্রুববাদের (লজিকাল পজিটিভিজমের) মিল আছে। এইচ. জে. উলদাল এ সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

'বিজ্ঞানের চোখে পৃথিবী বস্তু বা পদার্থ দ্বারা গঠিত নয়। বস্তুর অন্তর্নিহিত অপেক্ষকের সমষ্টি (টোটাল অব্ ফাংশনস) হল জগৎ। অপেক্ষকদের মিলনবিন্দুতে বস্তুরা স্বীকৃতি পায়। ... তাই বৈজ্ঞানিক ধারণায় পৃথিবী রেখাচিত্রের মতো, পুরো ছবির মতো নয়।'

[আউটলাইন অব্ গ্লসিমেটিক্‌স্ (১৯৫৭)]

এইরকম চরম ধারণা থেকে লেভি-স্ট্রোসও কিছুটা সরে এসেছিলেন। তাঁর রুশোপন্থী মোটিফ ধারণাকে (আদিম সমাজের আদর্শীকরণ, আধুনিক সভ্যতার সমালোচন, প্রকৃতি ও সংস্কৃতির বিরোধিতা) আদি অবয়ববাদের সঙ্গে মেলানো কঠিন। সাহিত্যিক অবয়ববাদের মূলে এইসব চেতনা ছাপ ফেলেছে। বিশেষ করে রাশিয়ান ফর্মালিজম্ এবং ভ্লাদিমির প্রপের ছায়া সবচেয়ে প্রগাঢ়।

ভ্লাদিমির প্রপ রাশিয়ান লোককাহিনীকে অসংলগ্ন উপাদানের সমাহার ভেবেছেন। তিনি একত্রিশটি বিষয়-উপাদানে এদের ভাগ করেছেন। যেমন—গল্পের কোনো একটি চরিত্র তখন ছিল না (অনুপস্থিতি), নায়ক বাড়ি ছাড়ল (প্রস্থান), নায়ক অলৌকিক বা ঐন্দ্রজালিক শক্তির সাহায্য পেল (রসদ বা সাহায্য)। তিনি মনে করলেন যে, লোককাহিনী অপূর্ব বস্তু নয়, ঐসব জাগতিক বিষয়ের নির্বাচন বা সমাহার। চরিত্রের ক্ষেত্রে তিনি সাতটি

ভাগ করলেন : দুর্বৃত্ত, সাহায্যকারী, দাতা, দূত, নায়ক, খলনায়ক আর উদ্দিষ্ট ব্যক্তি। শৈলীকে যদি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ভাষাবৈচিত্র্য ধরা যায় এবং সাহিত্যিক অবয়ব-উপাদানগুলিকে উপলক্ষের শ্রেণীবৈশিষ্ট্য বলা যায়, তাহলে প্রপের ব্যাখ্যান ভাষাবিজ্ঞান-নির্ভর শৈলীবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

প্রপের পরে সাহিত্যিক অবয়ববাদ এক নূতন বাঁক নিয়েছে। সেই পর্বান্তরের নাম হল নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ। এই মতের বিস্তৃত আলোচনায় একই সঙ্গে আমরা অবয়ববাদী সাহিত্য-সমালোচনার প্রতিফলন দেখতে পাব।

১.৭ ❑ নব্য-সমালোচনা বা নব্য-অবয়ববাদ (নিউ ক্রিটিসিজম্/নিও স্ট্রাকচারালিজম্)

রাশিয়ান ফর্মালিজম্ কি সত্যি সমালোচনার জগৎ থেকে হারিয়ে গেল? মনে হয় না। ১৯৬৮-তে একজন সমালোচক জানাচ্ছেন যে, 'সাহিত্যের নির্যাস বিষয়ে নয়, পদ্ধতির মধ্যে।' রোলঁ বার্ত, লোৎমন, তোদোরফ, সেমুর চ্যাটম্যান, আর. পি. ওয়ারেন, জে. সি. র‍্যানসম, সি. ব্রুকস, উইলিয়ম এম্পসন একত্রে না হলেও এই নব্য-সমালোচনার প্রয়োগ করলেন। বুর্জোয়া সাহিত্য-সমালোচনার সবচেয়ে প্রভাবশীল ধারা হল এই নব্য-সমালোচনা। এটি বহুমতের রীতি হলেও ফর্মালিজম্ এবং অবয়ববাদের মৌলিক সূত্র এখানে অবহেলিত নয়।

মতের পার্থক্য সত্ত্বেও নব্য-সমালোচনার মূল কথা হল : 'শিল্প একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জমাট-বাঁধা বস্তু। শিল্পের সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই।' মাইকেল দুফ্রেঁ অবয়ববাদী সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এর লক্ষ্য হল উপাদান ও উপাদানের বিন্যাসকে পৃথক করা; .... অর্থহীনতা থেকে অবয়বের মাধ্যমে অর্থের সৃষ্টি করা।' এখানে ইতিহাস, সমাজ, বাস্তব উপেক্ষিত হল।

বাস্তব জগতের তথ্যসংবাদরূপে একটি শিল্পকর্ম কিংবা সাহিত্য-বিশ্লেষণকে এঁরা বললেন 'বাস্তবের কুহক।' এঁদের কাছে সাহিত্য হল বীজগাণিতিক সমীকরণ। দুফ্রেঁর ভাষায়, 'জগতের সঙ্গে লেখকের মাধ্যমে কৃতির যে জন্ম-নাড়ির বাঁধন, সমালোচনা তাকে ছিন্ন করে।' তাই নব্য-অবয়ববাদী সমালোচনা হল বিশেষভাবে সমকাল-লয়ে বাঁধা (ডীপলি সিনক্রনিক), শিল্পকৌশল ও শিল্পকর্মের অন্তর্নিহিত অবয়বের অনুপুঙ্খ পরীক্ষা, অবয়বের বিশেষত্ব নির্ধারণকর্ম।

এদের একটি মত হল, গল্প ও আলোচনার (ডিসকোর্স) মিলিত ফল কাহিনি। কালচেতনা, দৃষ্টিকোণ আর কাহিনির প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে লেখক-পাঠকে আলোচনা চলে। গল্পকে কয়েকটি ছোটো ঘটনার এককে (ইউনিট) ভাগ করা যায়। এদের বলা যায় অপেক্ষক (ফাংশন)। দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষকরা হল 'মর্মস্থল' (কার্নেল)। গল্পের শাখা বিস্তারের এসব কেন্দ্রে প্রয়োগবৈচিত্র্যের বাছাই চলে। কিংবা এরা হল 'অনুঘটক' (ক্যাটালিস্ট) যারা ঐ প্রয়োগবৈচিত্র্যের ব্যাখ্যা করে। তৃতীয় স্তরের অপেক্ষকরা হল 'সূচক' (ইনডাইসেস)। এরা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়, কিন্তু চরিত্র ও পরিবেশকে নির্দেশ করে। যেমন, একজনের কোমরে বাঁধা তরোয়াল একটি অনুঘটক। যদি গল্পে তা ব্যবহৃত হয়, তবে তা সূচক। মর্মস্থল, অনুঘটক এবং সূচকের অনুপাত লেখকের কাহিনিগত বৈশিষ্ট্য বোঝায়। সেদিক থেকে এটি তাঁর বর্ণনার শৈলীবোধ। নব্য-

অবয়ববাদীরা তত্ত্বগতভাবে মর্মস্থল, অনুঘটকের ভাষার সঙ্গে সূচকের ভাষার পার্থক্য লক্ষ করেছেন। এইসব অপেক্ষককে প্রকাশের জন্য লেখক বিভিন্ন শৈলীর আশ্রয় নিতে পারেন—এই নূতন দিকটি এদের সমালোচনায় স্থান পেয়েছে।

য়ুরি লোৎমন নব্য-সমালোচনার একজন প্রধান স্থপতি। তাঁর মতে, অবয়বধর্মী ব্যাখ্যানে বিষয়ের গুরুত্ব কমানোর প্রশ্ন ওঠে না। "কোনো বিমূর্ত অবয়ব 'এক্স'-কে 'ধারণা' এবং 'কাব্যিক বাস্তবতার ধারণার বিকল্প' বলা চলে না। আমাদের 'ধারণা' (নোশন) এবং 'কাব্যিক বাস্তবতার ধারণার' (পোয়েটিক নোশন অব রিয়ালিটি) অবয়ববিচার প্রয়োজন।" লোৎমন প্রত্যক্ষতা, ধারাবাহিকতা এবং ফর্মালিজমের সঙ্গে অবয়ববাদের সম্পর্ক মানলেন না। লোৎমনের ভাষায়, 'শিল্প হল স্বাভাবিক ভাষার প্রতিরূপ পদ্ধতি (মডেলিং সিস্টেম)। এর নিজস্ব ভাষা আছে।'

লোৎমনের বক্তব্যে একটা অসংগতি এবং দ্বৈধ বক্তব্যের আভাস আছে। একটি কৃতিকে প্রসঙ্গচ্ছিন্ন সমগ্ররূপে বিচার করার কথা তিনি ভেবেছেন। অন্যদিকে কৃতির নিবিড়তাকে ছিন্ন করেছে, এমন উপাদান আলোচনার প্রতিশ্রুতি তিনি দিয়েছেন। একদিকে কৃতি অচিরস্থায়ী, অন্যদিকে ধারণাতত্ত্বের সাহায্যে অবয়ব নির্ণয়—এভাবে তাঁর তত্ত্বে বিমূর্ত ও মূর্ত অবয়বের বিরোধিতা চোখে পড়ে।

লোৎমন নিজেও এই স্ব-বিরোধিতার দায় এড়াতে শিল্পের 'অচিরস্থায়ী অর্থ'-এর কথা বলেছেন। যেমন, রুশোর জনগণকে তাঁর মানুষ-যুক্তি-নৈতিকতা এবং সমতাতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে। লোৎমনের মতে শিল্প যদি 'অনন্ত জগতের প্রতিরূপ' হয়, তাহলে শিল্প নিশ্চয়ই তন্ময় বাস্তবতাকে প্রতিরূপদান করে। আবার প্রতিরূপ তার অচিরস্থায়ী নিয়মে বাঁধা বলে বাস্তবতাচ্ছিন্ন বলা যায় কি? বিশেষ করে প্রতিরূপ-অপেক্ষকের (মডেলিং ফাংশন) অর্থ তাঁর কাছে সাহিত্যিক-ঐতিহাসিক-সামাজিক প্রসঙ্গ থেকে কৃতিকে স্বতন্ত্র করে দেখানো।

অনুভবের স্বতঃস্ফূর্ততা আর প্রতিরূপ অবয়বধারণার মাঝখানে একটা শূন্যতা বিরাজ করেছে। নিঃশব্দ শূন্যতা কখনও প্রিয় হলেও এখানে তা মারাত্মক। কেননা আমরা লোৎমনীয় দৃষ্টিতে তন্ময় জগতের প্রতিরূপ দেখতে গিয়ে দেখি পড়ে আছে নীরক্ত কাঠামো। অঙ্ক যাকে ছাড়পত্র দেয়, সৃজনশীল শিল্পে তার প্রবেশ নিষেধ হতে পারে। অবয়ববাদীরা এবং অঙ্ক-সংখ্যাতত্ত্বের দিকে ঝোঁকা সাহিত্য-আলোচকরা শিল্পে একটি বস্তুকে আমল দেননি, তা হল সৃজনশীল ব্যক্তির ভূমিকা। শিল্পী মানে তিনি জানবেন রচনা কেমন করে নির্মিত হয় এবং নির্বাচনের ক্ষেত্রে তার বিভিন্ন মত বেছে নেবেন—এমন একটি দুঃসাধ্য তত্ত্বে তাঁরা পৌঁছেছিলেন।

তাই লোৎমনের তত্ত্বকে সরিয়ে রেখে অন্য একটি নব্য-অবয়ববাদী তত্ত্ব তৈরি হল। একে বলা যেতে পারে 'দৃষ্টিকোণের' (পয়েন্ট অব্ ভিউ) তত্ত্ব। আমেরিকান নব্য সমালোচক পার্শি লাবক, এম. শোরার, অ্যালান টেট এবং এন. ফ্রায়েডম্যান এভাবে সাহিত্যালোচনা করলেন। দৃষ্টিকোণের তত্ত্ব মানলে উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে কিছু মূল্যবান মন্তব্য আমরা পেতে পারি। কিন্তু অবয়ববাদী সাহিত্যবিচারে কৃতির অন্তরঙ্গ নিয়মের সঙ্গে দৃষ্টিকোণের সম্পর্ক মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। লোৎমন এই বিষচক্র থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তি পাওয়া দূরে থাক, নিয়মের শৃঙ্খল তাঁকে আবার বন্দি করল।

লোৎমনের মতো রোলাঁ বার্তের সঙ্গে বাঙালি পাঠকের পরিচয় একেবারে কম বললেই চলে।[৪] প্রতীচ্যে এমন নবীন সাহিত্যালোচক মেলা কঠিন। বার্তের রচনার মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ যুক্তি এবং উপলব্ধিগুণ সবই আছে। কিন্তু তিনি তাঁর ভাবনার প্রকাশে খণ্ড রচনার পক্ষপাতী। কেননা, চিন্তার শিকলি নাকি অখণ্ড রচনায় ভাবনার বাধা সৃষ্টি করে। খণ্ড রচনার মধ্যেও কি সেই বাধার সৃষ্টি হয় না?

বার্ত ভাষা, শৈলী এবং লিখনের মধ্যে সীমানা টেনেছেন। নানা সর্বজনীন নিয়ম এবং অভ্যাসের যোগফল হল ভাষা। লেখকের জৈব অস্তিত্ব, অতীতের ছবি, বাগ্‌ভঙ্গি আর বিশেষ শব্দভাণ্ডার যখন শিল্পের স্বয়ংক্রিয়তায় (অটোমেশন) পরিণত হয়, তখন তা শৈলী হয়ে ওঠে। ভাষা আর শৈলীর মাঝখানে থাকে লিখন। ভাষা ও শৈলীতে লেখক স্বাধীন নন, লিখনে তিনি স্বাধীন।

বার্ত অন্যদের মতো দেশকালকে উপেক্ষা করলেন না। তিনি বললেন, লিখনের সঙ্গে সমাজের অভ্যন্তরীণ ইতিহাসের একটা সম্পর্ক আছে। সৃষ্টিশীল রচনায় বাচনিক সংস্থান করতে গিয়ে লেখক নিজের ও জগতের অবয়ব হারিয়ে ফেলেন। এখানে 'লেখা' এই ক্রিয়াটি অকর্মক। অন্যদিকে 'লিখিয়ের' কাছে এই ক্রিয়াটি সকর্মক। বচনের মাধ্যমে তিনি অভিজ্ঞতার সমর্থন বা ব্যাখ্যা করেন এবং শিক্ষাদান করেন। তিনি মনে করেন, তার বচন জগতের জ্ঞানান্ধকার দূর করবে। লেখক এবং লিখিয়ে—দুপক্ষই একটি সাধারণ লিখন নির্বাচন করেন। এইজন্য তাঁদের শৈলী বিচিত্র নয়। শুধু উপভাষা পার্থক্য সৃষ্টি করে। বার্তের কাছে উপভাষা হল মতবাদ বা জ্ঞানচর্চার বিষয় (প্রতীকবাদ, অস্তিত্ববাদ, ধর্ম ইত্যাদি)। এই কালে লেখক এবং লিখিয়ের পার্থক্য কমে যাচ্ছে। রচনাকার একসঙ্গে বিবেক এবং জনতার দায়িত্ব পালন করছেন। সমাজ এই সময় কোন্ ভূমিকা পালন করে? সমাজ সাহিত্যের জনমুখী চরিত্র দেখে পণ্যবস্তুরূপে কেনে। অথচ সমাজ লেখককে আপন করে না, তার থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। সমাজে লেখক বুদ্ধিজীবী হিসাবে প্রয়োজনীয়, অথচ সে ব্রাত্য।

বার্তের সাহিত্য-ভাষা-শৈলীর বিভাগ চমকপ্রদ, সন্দেহ নেই। তাঁর ভাষার সংজ্ঞায় আমরা একমত হলেও শৈলী ও কৃতির বিচারে আমরা আস্থাহীন। ভাষা যদি হয় আকাশের সীমানা, তাহলে রচনাকার সেই সীমানা ভেঙে কোথায় পৌঁছবেন? কোনো নবতর মহাকাশে অথবা দিগন্তে যেখানে সে পৃথিবীকে চুম্বন করে, সেই মাটির পৃথিবীতে? অথবা তিনি সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের খণ্ডাকাশ, পটাকাশ এবং ঘটাকাশের মতো বলতে চান যে, শৈলী ও কৃতি দুইই ভাষাকাশের প্রতিবিম্ব? আমরা যেমনভাবে তাদের দেখতে চাই, সেভাবেই উপলব্ধি করে থাকি।

রচয়িতাকে বুফোঁ যে নবমূল্য দিয়েছিলেন, এ যুগে তা অচল। রচয়িতার গুরুত্ব কমে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে যে, সত্যিকারের রচয়িতা আজ মৃত। আসলে সাহিত্যে লিখনের ঐশ্বর্য লেখকে নেই, আছে পঠন ও পাঠের মধ্যে। রচয়িতার কাজ হল প্রকরণ নিয়ে পরিশ্রম করা। আর ভাষা ব্যবহারে সেই পরিশ্রম করতে হবে।

বার্তও অবয়ববাদী। তিনি মনে করেন, সাহিত্যকৃতি হল ভাষাব্যবহার। তা সময় ও যুক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রচল অবয়বের মধ্যে এর তাৎপর্য অনুস্যূত হয়ে থাকে। সমালোচকের কাজ হল সাহিত্যকৃতির পুনর্বিন্যাস নয়, অবয়বতন্ত্রকে বিশদ করা। সমালোচক তাই এক অধিভাষার (মেটাল্যাংগুয়েজ) সৃষ্টি করেন। তা তার

আলোচনার বিষয়কে সংহত গাণিতিক পরিপূর্ণতা দেয়। গদ্যের ক্ষেত্রে শৈলীকে বিদায় জানালেও কবিতায় তিনি শৈলীকে অগ্রাহ্য করেননি। আধুনিক কবিতায় লিখনের অস্তিত্ব নেই, আছে শৈলী।

বার্ত অবয়ববাদী হলেও তাঁর প্রাথমিক তত্ত্ব থেকে সরে এসেছেন। ভাষাবিজ্ঞানীর মতো বার্তও আখ্যানের নিহিত শৃঙ্খলাপ্রণালীকে জানতে চেয়েছিলেন। তিনি প্রথমে ভেবেছিলেন, 'রচনাগুলি থেকে একটি বা কয়েকটি ছাঁদ বের করা দরকার। তাহলে ঐ ছাঁদের দিকে উঠে গিয়ে আবার অবরোহী পদ্ধতিতে সাহিত্যকৃতিতে নামা যাবে' (কণ্ঠস্বরের ফসল)। কিন্তু নিৎসে, লাকাঁ ও দেরিদা পড়ে তাঁর মনে হয়েছে, 'পুনরাবৃত্তি, বাঁধা ছক, সাংস্কৃতিক ও প্রতীকী বার্তাবিধির (কোড্) দ্বারা আবৃত হলেও প্রতিটি পাঠ্য তার স্বাতন্ত্র্যে অনন্য।' প্রতিটি রচনা যেমন অনন্য, তেমনি তার মধ্যে বহুত্বও আছে। বার্তের কাছে তাই শেষ পর্যন্ত বার্তাবিধির বয়ন (টেক্সচার অব্ কোড) গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

বার্তের মত পুরোপুরি মানা যায় না। তিনি নিজেও তা অস্বীকার করেন। লেখক-পাঠক-সমাজের সম্পর্ক, লেখার সামাজিক মূল্যায়ন, সাহিত্যচিন্তায় ভোগসুখবাদ এবং সর্বোপরি রচনার বহুত্বগুণের মধ্যে অনন্যতার সন্ধান বার্তের সমালোচনাকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়ভূমির অস্বীকারে এক সংকীর্ণ মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

১.৮ ❑ অবয়ববাদ : প্রাগ-গোষ্ঠী

শ্কোলোভস্কি লেনিনের শৈলী আলোচনা করতে গিয়ে কতকগুলি গুরুতর কথা উচ্চারণ করেছিলেন :

১. স্থির গদ্যরূপ এবং প্রচল শৈলীর বিরুদ্ধে লেনিন সংগ্রাম করেছিলেন।

২. লেনিনের গদ্যশৈলী বুঝতে গেলে একে একটা প্রতিষ্ঠিত ঘটনারূপে ভাবা চলবে না, চলিত গদ্যশৈলী থেকে সরে আসা (শিফ্ট) রূপে দেখতে হবে।[৫]

স্বাভাবিকভাবে এই নূতন বিচারে ওপোয়াজের দুটি বক্তব্য প্রতিষ্ঠা পেল :

(ক) বিষয়ানুবন্ধতা (অটোম্যাটিজেশন) : বিষয়কে যথাযোগ্যরূপে এবং অভিপ্রেতভাবে প্রকাশের জন্য শৈলীকে সমর্থ করা (পবিত্র সরকার, ১৯৮৯, 'রীতি থেকে রীতিবিজ্ঞান', পৃ. ৫৯)।

(খ) বিস্ময়ীকরণ ('মেকিং স্ট্রেঞ্জ') : বিষয় থেকে স্বাধীনতার বোধ, লেখকের নিজস্ব শৈলীর আকর্ষণীয়তা।

প্রাগ-স্কুলের তাত্ত্বিকরা ওপোয়াজের এই দুটি সূত্র ধরে একটি আলোচকমহল গড়ে তোলেন। একে আমরা অবয়ববাদীদের প্রাগ-গোষ্ঠী (প্রাগ স্কুল অব্ স্ট্রাকচারালিস্টস্) নাম দিতে পারি। কবিতার শৈলী নিয়ে অন্যান্য অবয়ববাদীরা ততটা ভাবেননি। প্রাগ-গোষ্ঠী কবিতার ভাষা নিয়ে নানা ভাবনা ভাবলেন। প্রাগ-গোষ্ঠীর মতামত ছিল একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞান নির্ভর।

ভাষায় দুটি শৈলী থাকে—(১) সংপ্রেষক (কমিউনিকেটিভ), অন্যটি হল নান্দনিক (ঈস্থেটিক)। প্রথমটিতে মানুষের জ্ঞানসংবাদ জানানোর চেষ্টাই প্রধান। এই কাজ দুটি পদ্ধতিতে করা হয়—(১) স্পষ্টতাদান (ইনটেলেকচুয়ালাইজেশন) বা যুক্তিদান (র‍্যাশনালাইজেশন)। যুক্তি ও তত্ত্বের বিষয়কে স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য ভাষার

শব্দকে সুনির্দিষ্ট এবং একার্থকরূপে ব্যবহার করা হয়। পূর্বে আলোচিত (ক) বিষয়ানুবন্ধতা হল দ্বিতীয় পদ্ধতি। এই দুইয়ে মিলে আমাদের সংপ্রেষণকর্মকে সহজ করে। সাধারণ কথা ও লেখায় স্পষ্টতা জরুরি নয়। বিষয়ানুবন্ধতা লাগে সংপ্রেষণকে স্পষ্টতা দিতে গেলে। এখানে বিষয়ের কাছে শৈলী নতজানু। অথচ শৈলী যখন নান্দনিক হয়ে ওঠে, তখন সে বিষয়ের পৃথিবী ছেড়ে স্বাধীন আকাশ চায়। এখানে শৈলী আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

কিন্তু কীভাবে শৈলী এমন আকর্ষক রূপ লাভ করে? এটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হাব্রানেক একটি নূতন পদ্ধতির কল্পনা করলেন, তা হল প্রমুখণ (ফোরগ্রাউন্ডিং, পবিত্র সরকার; সম্প্রতি কেউ কেউ একে মঞ্চন নামে অভিহিত করতে চান)। কবিতা এবং সাহিত্যের কাজ হল প্রকাশ (এক্সপ্রেশন)। তাই ভাষা এখানে বিষয়কে ছাপিয়ে যায়। বাক্যের শরীর অর্থের চেয়ে বেশি মনোযোগ কাড়ে এই প্রমুখণে। সাহিত্যের সব শাখার মধ্যে কবিতায় প্রমুখিত অংশের সংখ্যা বেশি। তাই জাঁ মুকারোভস্কি বলেছেন :

> 'ইন পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ ফোরগ্রাউন্ডিং অ্যাচিভস্ ম্যাক্সিমাম ইনটেনসিটি টু দা এক্সটেন্ট অব্ পুশিং কমিউনিকেশন ইনটু দা ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যাজ দা অবজেকটিভ অব্ এক্সপ্রেশন অ্যান্ড অব্ বিইয়িং ইউজ্ড্ ফর ইটস্ ওন সেক; ইট ইজ নট ইউজ্ড্ ইন দা সার্ভিসেজ অব্ কমিউনিকেশন, বাট ইন অর্ডার টু প্লেস ইন দা ফোরগ্রাউন্ড দা অ্যাক্ট অব্ এক্সপ্রেশন, দা অ্যাক্ট অব্ স্পীচ ইটসেলফ।'
>
> (দা স্ট্যান্ডার্ড ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড পোয়েটিক ল্যাংগুয়েজ)

প্রমুখণ যদি হয় সাহিত্যের বিশেষত কবিতার মৌল ধর্ম, তাহলে তা কীভাবে করা হয়? প্রাগ-গোষ্ঠীর মতে, ভাষার আদর্শ-রূপ থেকে সরে আসাই (আ ডিভিয়েশন ফ্রম দা নর্ম) হল প্রমুখণ। ব্যাকরণে ভাষার আদর্শ-রূপের একটা আদল দেওয়া থাকে। এগুলি নিয়ম বলে নিয়ম ভাঙার সুযোগ নেই। এই নিয়মের বন্ধন প্রত্যেক লেখকই নিজের স্বভাবমতো ভাঙতে চান। মুক্তি চাইলে আর ব্যাকরণের প্রতিটি সিঁড়িতে পা পড়ে না, একটা নূতন চলন আসে।

তাই প্রমুখণ হল ভাষার আদর্শ-বলয় থেকে লেখকের সরে আসার প্রক্রিয়া। প্রতিদিনের কান্না-হাসির ছোঁয়া লাগা ধ্বনি, শব্দ, বাক্য, খণ্ডবাক্য, প্রবাদ এভাবে কাব্যের সংসারে আলাদা ভাব পায়। বাংলায় 'নোনা' শব্দের প্রয়োগ এভাবে দেখা যেতে পারে। বিশেষ্যে এর অর্থ দুটি—১. আতাজাতীয় ফলবিশেষ, ২. মাটির লবণজাতীয় উপাদান। ক্রিয়ার অর্থ হল—মাটির লবণজাতীয় উপাদানের প্রতিক্রিয়া (নোনা লাগা)। বিশেষণ হলে হয় লবণাক্ত (নোনা জল)। কিন্তু জীবনানন্দের 'নোনা মেয়ে মানুষ' ব্যাখ্যা করব কীভাবে? নারীকে সংসারের পুরুষ হাত স্বাদহীনরূপে পরিণত করেছে। সাধারণ সংলাপে এভাবে 'নোনা' আসে না। এভাবেই শব্দটি কবিতায় প্রমুখিত (ফোরগ্রাউন্ডেড) হল।

এই সরে আসার সীমানা-সরহদ্দ কতটা? অনেক সময় ভাষার আদর্শরূপ থেকে সরে আসা নেই। অথচ একটা আলাদা সংগঠিত বাণীরূপ পাই। তাই কাব্যভাষা আদর্শ ভাষা বা মৌখিক ভাষার সমাহার ও বিন্যাসে ভাষানিয়ম ভেঙে ফেলবে, এমন আশা করা যায় না।

রোলাঁ বার্তের ধারণায় 'লিখনের শূন্যাঙ্ক' (জিরো ডিগ্রি অব্ রাইটিং) ছিল; প্রাগ-গোষ্ঠীর ধারণা এরই পূর্বসূরি। প্রথমে একটি রচনারীতি অভিনব, বিচ্যুত (ডেভিয়েটেড) এবং নান্দনিক থাকে। সাহিত্যে প্রচলন ঘটে

গেলে ঐ রীতি নান্দনিক কার্যাবলী থেকে সরে গিয়ে সংপ্রেষণের কাজেই ব্যবহৃত হয়। নান্দনিকতা এভাবেই বিদায় নেয়।

প্রাগ-গোষ্ঠীর এই প্রশ্নও ছিল যে, এই ভাষাকে কী চোখে দেখব। কাব্যভাষাকে যদি বলি সংগঠিত বাণী, তাহলে অবয়ববাদের প্রশ্ন আড়ালে থাকে না। শৈলীবিজ্ঞানের কাজ হল, সংস্থানের নীতিগুলো আবিষ্কার করে শৈলীবৈশিষ্ট্য দেখানো। 'লেভি স্ত্রোস অবয়ববাদের অন্য নাম' বাক্যটা একটু অত্যুক্তি হলেও তিনি নৃতাত্ত্বিক অবয়ববাদের সূত্র ট্রুবেৎসকয়, য়াকোবসনের মধ্যে পেয়েছিলেন। ট্রুবেৎসকয় স্ত্রোসকে আকর্ষণ করেছিলেন এই কারণে যে তিনি ভাষাবিজ্ঞানে পদ্ধতিগত অবয়ববাদ এবং সর্বজনীনবাদকে স্বীকার করে পরমাণুবাদকে খারিজ করেছিলেন। প্রাগের এই মহল ছিল ভাষাবিজ্ঞানের উপর একান্ত নির্ভরশীল। ভাষার উপাদানগত বিশ্লেষণসংস্থান এবং গতিশীলতা বিজ্ঞানের অন্য শাখায় অবয়ববাদীদের মনোযোগী করেছিল।

কিন্তু এইসব অবয়ববাদীরা ভাষাবিজ্ঞানের কোন্ পথ বেছেছিলেন? প্রতিটি ভাষাই যেহেতু অনন্য, সুনির্দিষ্ট এবং বিশেষ পদ্ধতিরূপ, তাই তাদের একক উপাদানকে একটা সম্পর্কের সূত্র ধরে চিনতে হবে। ধ্বনি, শব্দ, অর্থ এইভাবে ভাষার একেকটি একক (ইউনিট), আবার সকলে একটি জটিল সূত্রে জড়িত।

সাহিত্যের ভাষা তো সাধারণত ভাষিক ব্যাপার নয়। তাই অসাধারণ ভাষার মধ্যে সম্পর্কের সূত্র কীভাবে খুঁজব? এদের সম্পর্কিত অস্তিত্বের ধারণা জোনাথান কালারের মতে দুশ্রেণীর—বিয়োজক এবং সংযোজক (ডিসট্রিবিউশনাল, ইনট্রিগ্রেটিভ)। যেখানে উপাদানেরা একজাতীয় সেখানে সম্পর্ক হল—আন্বয়িক (সিনট্যাগমেটিক) এবং নির্বাচিত (প্যারাডিগমেটিক)। সব মিলিয়ে এই ধারণায় খণ্ড এবং অখণ্ডের কল্পনা আছে। অন্যদিকে খণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের এবং খণ্ডের সঙ্গে অখণ্ডের একটি সম্পর্ক কল্পিত হয়েছে।

অবয়ববাদের এই নব-ব্যাখ্যানে ব্যক্তিগত রুচির প্রভাব কমল। প্রচল সমালোচনার উচ্ছ্বাসভরা অস্পষ্ট উচ্চারণের বদলে এল সাহিত্যভাষাকে বোঝার কঠিন পরিশ্রমী আরোহী সিদ্ধান্তপ্রবণতা। ভাষাশৈলীর এই অবয়ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির ইতিহাস এখানেই শেষ হল।

এরপর আমরা খুঁজতে চাই, শৈলীবিজ্ঞানের নানা মহল কী কী? আমরা এই দীর্ঘ আলোচনা এই কারণে করলাম যে শৈলী নিয়ে নানা দর্শন-প্রস্থান সক্রিয় ছিল। এই ভাবনা অখণ্ড নয়। আবার কালবিচারে এর মধ্যে পারম্পর্য সর্বত্র নেই। নানা চিন্তার টুকরো দর্শন ও ভাষাতত্ত্ব ঘিরে যে শৈলীকে খুঁজতে চেয়েছে, তারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপরেখা আঁকার প্রয়াস করা হল এযাবৎ আলোচনা অংশে।

১.৯ ❑ শৈলীবিজ্ঞান : নানা মহল

শৈলীর অস্তিত্ব থাকলেও সংজ্ঞার মধ্যে তাকে ধরা যায়নি। শৈলীবিজ্ঞান এমনতরো সমস্যার মুখোমুখি করে না। কারণ হাজার বছরের শৈলী-আলোচনায় ব্যক্তিগত নানা দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহৃত হয়েছে। আর শৈলীবিজ্ঞান ঐ হাজার বছরের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষাচর্চার পথ ধরে একটি ধারণাকে জানায়। জে. ডব্লিউ. টার্নার বলেন :

'লিংগুইস্টিক ইজ্ দা সায়েন্স অব্ ডেসক্রাইবিং ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড শোয়িং হাউ ইট ওয়র্কস; স্টাইলিস্টিক্স্ ইজ দ্যাট পার্ট অব লিংগুইস্টিকস হুইচ কনসেনট্রেটস্ অন ভেরিয়েশন ইন দা ইউজ অব্

লাংগুয়েজ, অফেন, বাট নট এক্সক্লুসিভলি, উইথ স্পেশাল অ্যাটেনশন টু দা মোস্ট কনশাস অ্যান্ড কমপ্লেক্স ইউজেস ইন লিটারেচার।'

(স্টাইলিস্টিক্স্, পৃ. ৭)

স্টাইলিস্টিক্স্ বা শৈলীবিজ্ঞানে শৈলীর চর্চা করা হয়। এই চর্চা বৈজ্ঞানিক অথবা পদ্ধতিগত (মেথডোলজিক্যাল) হতে পারে। যেহেতু এটি ভাষার (সাহিত্যভাষা) চর্চা, তাই ভাষাবিজ্ঞানকে আলোচনার আওতা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে মনে, সফল সমালোচনা করতে গেলে সাহিত্যকে ভাষানির্মিতিরূপে দেখব না সমগ্র কল্পনার মূর্তিরূপে দেখব। কেননা অনেক সময় ভাষার নিয়ম মেনেও একটি রচনা নূতন আবেদন জানাতে পারে। এখানে একটা সমগ্র অবয়বকল্পনা আছে, ভাষাও যার মধ্যে পড়ে।

শৈলী শব্দটির অর্থ হল ভাষাবৈজ্ঞানিক রূপান্তরকর্ম (যা কৃতি ও পরিস্থিতির উপলক্ষকে যুক্ত করে)। লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিক্স্ (বা স্টাইলো-লিংগুস্টিকস্) সেই শৈলীবিজ্ঞান যা ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণার সাহায্যে উদ্দীপকদের আবিষ্কার ও বর্ণনের কাজ করে। ভাষাবৈজ্ঞানিক ধারণাকে শৈলীবিজ্ঞানের লক্ষ্য ছাড়িয়ে যেতে পারে। অবয়ববাদী, সাহিত্যিক ও ইতিহাসমুখীভাবে একটি কৃতি বা ভাষার চর্চাও তার লক্ষ্য হতে পারে।

শৈলীবিজ্ঞানের এই ভাষাবৈজ্ঞানিক মহলের কয়েকটি তত্ত্ব এখানে উপস্থিত করা হচ্ছে :

১. দুটি রচনায় যদি ভাষার উপাদানের ঘনত্বের (ডেনসিটি) বেশি ফারাক দেখা যায়, তাহলে সেইসব বৈশিষ্ট্যকে শৈলীবৈশিষ্ট্য (স্টাইল মার্কারস্) বলতে পারি। এই দুটি রচনার একটি হল কৃতি, অন্যটি হল আদর্শ ভাষারূপ (স্ট্যান্ডার্ড ল্যাংগুয়েজ নর্ম)। আদর্শ ভাষারূপ হল যেসব রচনার সঙ্গে আমরা কৃতির তুলনা করি। যদি কৃতি ও আদর্শ ভাষারূপের বৈশিষ্ট্যের ঘনত্বের পার্থক্য কম হয়, তাহলে তাকে বলব শৈলীগতভাবে স্বাভাবিক (আনমার্কড্ অর্ নিউটারাল)। কিন্তু এই তৌলনকর্ম এবং বিচারে পরস্পরবিরোধিতা দেখা যায়। কেননা বিভিন্ন আলোচক কৃতিকে নানা আদর্শ ভাষারূপের সঙ্গে মেলাতে চাইতে পারেন। তখন শৈলীবৈশিষ্ট্যের বিভাজন অর্থহীন হয়ে পড়ে।

২. ভাষাবিজ্ঞানে সাহিত্যপ্রথা নিজের জোরে প্রবেশ করতে পারে। কেননা কৃতির সঙ্গে আদর্শ ভাষারূপের তুলনার ক্ষেত্রে প্রসঙ্গবিচারে তারা অংশীদার। তাই ভাষাবিজ্ঞান, শৈলীবিজ্ঞান ও সাহিত্যালোচনার পারস্পরিক সম্পর্ক থাকা একান্ত প্রয়োজন।

৩. আমরা শৈলীবিজ্ঞানের টার্নার-কৃত সংজ্ঞায় আস্থা রেখে একে ভাষাবিজ্ঞানের উপ-শাখাও ভাবতে পারি। সাহিত্যকৃতির বৈচিত্র্যবিচার এর একটি অনুসন্ধান-কর্ম হতে পারে। সাহিত্যালোচনার উপশাখারূপে একে ভাবা যায়, যেখানে ভাষাবিজ্ঞান মাঝে মাঝে অবলম্বন করা হয়। একে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পদ্ধতি ভাবা যায় যেখানে প্রয়োজনে ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্যালোচনার শরণ নেওয়া যায়।

এদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভালো, এমন বলা যায় না। তিনটিরই দোষ-গুণ আছে। এমন হতে পারে যে, একটির প্রয়োজন কখনও অন্যের তুলনায় সুফল দেয়। শৈলীকে ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যরূপে ভাবা আর সাহিত্যের কারণে (লিটারারি কজ) একটি রচনার শৈলী বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। শৈলী-ভাষাবিজ্ঞানের পাশে সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞানের নানা ভঙ্গির কথা আমরা আগের আলোচনায় ধরার চেষ্টা করেছি।

৪. ব্যাকরণের পথে শৈলীব্যাখ্যার সুবিধা এবং অসুবিধা দুইই আছে। সোস্যুরের লাং বা পারোল কিংবা চোমস্কীয় কম্পিটেন্স ও পারফর্মেন্স—এই দুটি তত্ত্ব একটি জায়গায় একমত। তা হল ভাষার নিয়ম-বাঁধা পদ্ধতি

এবং ভাষার বিশাল প্রয়োগবৈচিত্র্য। আমরা যদি প্রচল ব্যাকরণের মধ্যে শৈলীকে আনি, তাহলে প্রথমে আমাদের নিয়মগুলোর শৈলীবৈজ্ঞানিক উপযোগিতা স্থির করতে হবে। তাহলে দেখব যে, দু-ধরনের শৈলীব্যাকরণগত নিয়ম সৃষ্টি হচ্ছে—(১) সুনিশ্চিত (ক্যাটাগরিক্যাল), (২) পরিবর্তক (ভেরিয়েবল)।

এবার একটি সমস্যা আসে। মুকুন্দরাম, মধুসূদন এবং রবীন্দ্রনাথের শৈলীকে কি বাংলা ভাষার উপশাখারূপে ভাবব, না তাদের আলাদা ভাষার ব্যাকরণরূপে চিহ্নিত করব? এখানে ব্যাকরণের নিয়ম কাজে লাগে না। যদি আমরা এদের জন্য তিনটে ব্যাকরণ আলাদা করে লিখি, তাহলে ব্যাখ্যান অমিতব্যয়ী হবে। কেননা অনেক মন্তব্য বারবার বা পৌনঃপুনিকভাবে স্থান করে নেবে। এভাবে শৈলী-আলোচনা এক কঠিন, অবাস্তব বস্তুকর্মের অভিজ্ঞান হয়ে দাঁড়াবে। আমরা তাহলে এমন একটা ব্যাকরণ লিখি না কেন, যেখানে মৌলিক, শৈলীবিজ্ঞাননিরপেক্ষ জ্ঞান পরিবেশিত হবে (যাকে বলা যায় শূন্যাঙ্কের ব্যাকরণ)? সেখানে শৈলীবিজ্ঞাননিরপেক্ষ এবং শৈলীবিজ্ঞানঘেঁষা আলোচনা থাকবে। কিন্তু প্রথম তিনটি ব্যাকরণ লেখার চেয়ে এই কাজ আরও দুরূহ।

৫. শৈলীর ব্যাকরণ লিখলে তাতে শৈলীবৈজ্ঞানিক তথ্য কতটা প্রয়োজনীয়, তাও ভাবা দরকার। আমরা কি সবচেয়ে গুরুতর শৈলীবৈজ্ঞানিক স্তর বাছব না অনেক শৈলীর আলোচনা সাজাব? এভাবে শৈলীর সংখ্যা অনন্ত হয়ে দাঁড়ায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, এইসব নিয়মগুলি কেমন হবে। সেখানে উপলক্ষের মানক এবং নিয়মের প্রয়োগকুশলতা বড়ো হবে।

১.১০ ❑ উপলক্ষের মানক (কনটেক্সট প্যারামিটার)

আরিস্টটল বলেছিলেন যে, প্রতিটি অলংকারের নিজস্ব উপযুক্ত শৈলী আছে; কথ্য ও লেখ্য শৈলী আলাদা। আগে আমরা বলেছিলাম যে, শৈলীর সীমান্ত এখানে অস্পষ্ট; তার মেলামেশার বিন্দুটি অব্যাখ্যাত রইল। তাই উপলক্ষের স্থির তালিকা মানে শৈলীরও স্থির তালিকা বোঝায়। কিন্তু সমাজে উপলক্ষের মানক অনেক জটিলতম বলে শৈলীর মানক জটিলতা পায়।

উপলক্ষের শ্রেণীবিচারে দেখতে হবে কোন্‌গুলি শৈলীবিজ্ঞানিকভাবে প্রয়োজনীয় আর কোন্‌গুলি অতিরেক বা অপ্রয়োজনীয় (রিডানডেন্ট)। একংভিস্ট-স্পেন্সার-গ্রেগরী তাঁদের 'লিংগুইস্টিকস্ অ্যান্ড স্টাইল' (১৯৬৪) গ্রন্থে উপলক্ষ-বৈশিষ্ট্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়েছিলেন :

কৃতিগত উপলক্ষ

ভাষাবৈজ্ঞানিক কাঠামো :

ধ্বনি (স্বরের মাত্রা) উপলক্ষ

ধ্বনিতা উপলক্ষ

রূপগত (মেয়েটি যায়/সে গিয়েছিল/সে যাবে) উপলক্ষ

অন্বয়গত (বাক্যের দৈর্ঘ্য এবং জটিলতা) উপলক্ষ

শাব্দিক উপলক্ষ,

যতিচিহ্নাবলী।

রচনাগত কাঠামো :

সময়

উক্তি, সাহিত্যিক প্রকৃতি, বিষয়ের শ্রেণী;

বক্তা/লেখক

শ্রোতা/পাঠক

বক্তা/শ্রোতা, লেখক/পাঠকের সম্পর্ক (লিঙ্গ, বয়স, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা, শিক্ষা, সামাজিক শ্রেণী, ও মর্যাদার স্তর, সমজাতীয় অভিজ্ঞতার সূত্রে বিচার্য)

পরিস্থিতি ও পরিবেশ প্রসঙ্গ :

অঙ্গাভঙ্গি ও শারীরিক ক্রিয়া

উপভাষা ও ভাষা

এছাড়া একটি কৃতিকে তার যথার্থ ঐতিহাসিক ও ঔপভাষিক পরিবেশে দেখতে হবে। তারপর তিনটি উপলক্ষ-মানকের (কার্যক্ষেত্র, ধরন এবং উদাত্ত সুর) দৃষ্টিতে দেখতে হবে। কার্যক্ষেত্র (ফীল্ড) হল প্রসঙ্গের সঙ্গে কথোপকথনের যোগ। দীর্ঘ কৃতিতে কার্যক্ষেত্র বদলায়। উপন্যাসে লেখক অনেক কার্যক্ষেত্র নির্মাণ করেন। ধরন (মোড) বলতে তাঁরা কথ্য ও লেখ্য কথোপকথনের ফারাক বুঝিয়েছেন। ঔপন্যাসিক বা নাট্যকার স্বাভাবিক উক্তির একটা বিভ্রম তৈরি করেন। লিখিত ও অলিখিত উক্তির পার্থক্যও দেখতে হবে। উদাত্ত সুর (টেনর) হল বক্তা-লেখকের সঙ্গে শ্রোতা-পাঠকের আনুষ্ঠানিকতার সম্পর্ক। এদের বক্তব্যে উপলক্ষ-বিভাগের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক ধারণা জড়িয়ে আছে।

ক্রীস্টাল ও ডেভি পরিস্থিতিগত নিয়ন্ত্রকের (সিচুয়েশনাল কনস্ট্রেইন্ট) একটি পদ্ধতি লক্ষ করেছেন :

১. ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য

উপভাষা

কাল

২. কথোপকথন :

ক. (সরল/জটিল) মাধ্যম (বাচন, লেখন)

খ. (সরল/জটিল) অংশগ্রহণ (একোক্তি, সংলাপ)

৩. কোনো পেশাগত, বৃত্তিগত কাজ বা বিদ্যার সঙ্গে সম্বন্ধ (প্রভিন্স),

সামাজিক স্তর (স্ট্যাটাস) এবং উদ্দেশ্য (মোডালিটি)

সংপ্রেষণের রূপ ও মাধ্যম (চিরকুট, পোস্টকার্ড, টেলিগ্রাম, প্রতিবেদন, বক্তৃতা ইত্যাদি)

অভাষিক (নন-ভার্বাল) সাময়িক ও ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ (সিংগুলারিটি)

ভিনোগ্রাদফ এবং কস্টোমারফ ১৯৬৭ নাগাদ এই অপেক্ষক-বিন্যাসকে অস্বীকার করে পাঁচটি যুগ্ম-বৈপরীত্যের (বাইনারি অপোজিশন) শ্রেণী ভেবেছিলেন। এগুলি হল :

১. সংপ্রেষণের মাধ্যম—বাচন, লিখন, অঙ্গাভঙ্গি

২. সঙ্গীর উপস্থিতি/অনুপস্থিতি

৩. তথ্যের একমুখী/দ্বিমুখী প্রবাহ

৪. ব্যক্তিগত/সমষ্টিগত সংপ্রেষণ

৫. নৈকট্য/দূরগত সংপ্রেষণ।

এই পাঁচটির সম্ভাব্য সমাহার হল বত্রিশটি।

মানকগুলোর আরও স্পষ্ট সংজ্ঞা চাই, একথা এংকভিস্ট বলেছিলেন। যেমন, দুজন উকিল চায়ের দোকানে আড্ডা মারলে তাদের কথাবার্তা আইনঘেঁষা হবে না। অর্থাৎ আইনের কথাবার্তাকে এখানে আনুষ্ঠানিক রীতি (ফর্মাল টাইপ) মনে করছি। বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় এই আনুষ্ঠানিক এবং তার অতিরেক বিবেচনা করা দরকার। সংস্কৃতির আসরে এই উপলক্ষ মানকগুলির বিচলন এবং বিমিশ্রণ লক্ষ করি। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষকে মান্য বা উৎসাহিত করা হয়।

৬. তাই শৈলীর ব্যাকরণ লেখার প্রধান বাধা উপলক্ষ। কেননা ভাষাবিজ্ঞানের পথে উপলক্ষ নির্দেশ করলেও জাতি-দেশ-কালগত সংস্কৃতির বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করা যায় না। ভিনোগ্রাদফের মত এই ব্যাপারে অনেক বেশি গ্রহণীয়। কিন্তু সংপ্রেষণকর্মের আরও গভীর ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ভাষিক সংপ্রেষণের একটা তাত্ত্বিক শিকড় খোঁজা হলেও অবাচিক বা অঙ্গাভঙ্গির সংপ্রেষণ (জেশ্চার ল্যাংগুয়েজ বা ফেটিক কমিউনিকেশন) নিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে আলোচনা ভীষণ কম। আবার অ-বাচিক বলে গোঁড়া ভাষাবিজ্ঞানীরা একে ভাষার অন্দরমহলে স্থান দিতে এখনও অরাজি (কিংবা নিমরাজি বলতে পারি)।

৭. এ বিষয়ে রূপান্তরী ব্যাকরণ (ট্রান্সফর্মেশনাল গ্রামার) পিছিয়ে নেই। রিচার্ড ওহ্‌মান বীজ-বাক্যগুলির (কার্নেল সেন্টেন্স) পুনর্নির্মাণ করলেন। এর মধ্যে স্বেচ্ছামূলক (অপশন্যাল) রূপান্তরগুলির তালিকা গণনা করে বীজ-বাক্য ও কৃতির উপরিতলের (সারফেস স্ট্রাকচার) ব্যাখ্যান করলেন। ফকনার, হেমিংওয়ে, লরেন্স, হেনরী জেমসের শৈলী বিচার করে তিনি দেখালেন যে, পৌনঃপুনিকতার ছাঁদে প্রত্যেক লেখক বিশেষ স্বেচ্ছামূলক রূপান্তর ব্যবহার করেন। এই রূপান্তরগুলিকে বহিরঙ্গ এবং স্পষ্ট শৈলীচিহ্ন বলতে পারি। চোমস্কি এবং ষাটের দশকের রূপান্তরী ব্যাকরণ আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে। আদর্শরূপ বহু সময় জটিলতা আনে। তাই শৈলীবিজ্ঞানের প্রয়োগকারী নিজের প্রয়োজনমত ব্যাকরণ-আদর্শ অনুসরণ করবেন।

৮. এম. এ. কে. হ্যালিডে এবং আরও অনেকে প্রণালীবদ্ধ ব্যাকরণ (সিস্টেমিক গ্রামার) ভেবেছেন। ভাষা চারটি স্তরে সক্রিয়তা দেখায় : একক, অবয়ব, শ্রেণী, প্রণালী। একক দিয়ে. গঠিত অবয়বকে প্রণালীবদ্ধভাবে ব্যাখ্যানই তাঁদের অন্বিষ্ট। একে বলা যায় প্রণালীর প্রণালী। হ্যালিডের এই তত্ত্বে ক্রম (স্কেল) এবং নির্বাচনও (চয়েস) উপেক্ষিত নয়। নির্বাচনের সম্পর্কের আবার উপ-প্রণালী আছে। রূপান্তরী ব্যাকরণের চেয়ে এতে সুবিধা হল, উপপ্রণালীগুলিকে লক্ষ করা যায়।

৯. কৃতির জটিলতা এবং পাঠযোগ্যতা (কমপ্লেকসিটি অ্যান্ড রিডেবিলিটি) মিলার ও কোলম্যানের কাছে উল্লেখ্য শৈলীবৈশিষ্ট্যরূপে বিবেচিত হয়েছে।

এই দুটি বিষয় তাঁরা এভাবে আলোচনা করেছেন :

ক. শব্দভাণ্ডারের সহজতা ও কাঠিন্য

খ. বাক্যাংশ বা বাক্যগঠনের সহজতা ও কাঠিন্য

গ. অন্তর্বাক্যের সংগতি ও যোজনার ছাঁদ

ঘ. উল্লেখ (অ্যালিউশন), অলংকারের প্রকৃতি ও ঘনত্ব

১০. শৈলীভাষাবিজ্ঞানের প্রতিরূপ হিসাবে এরিক এংকভিস্ট তাই পাঁচটি প্রয়োজনকে চিহ্নিত করেছেন :

ক. পরিবর্তক এবং উপলক্ষের আলোচনা করতে হবে।

খ. প্রতিরূপে সংগতি থাকবে।

গ. প্রতিরূপকে পর্যাপ্ত (অ্যাডিকোয়েট) ব্যাখ্যাযোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ঘ. নির্দিষ্ট এবং সম্ভাব্য নিয়মগুলি স্থান পাবে।

ঙ. প্রয়োগগতভাবে বাস্তব এবং স্পষ্ট সংজ্ঞাধারণা থাকবে।

যতক্ষণ না আমরা মূল ভাষা-অংশে শৈলীবিজ্ঞানকে কাজে লাগাচ্ছি, ততক্ষণ কোনো সমস্যা নেই। একটি পদ্ধতিকে কঠোরভাবে গ্রহণ করা এখনও ভাষাবিজ্ঞানে যায় না। একে বলা যায় বিজ্ঞানেরই অসুবিধা। কাজেই একটি পদ্ধতি শৈলীভাষাবিজ্ঞানে অনেক সময় মামুলি ব্যবহারে পরিণত হতে পারে।

এই পদ্ধতির প্রয়োগে কেউ কেউ সংখ্যাতত্ত্বের উপর নির্ভর করতে চান। কিন্তু ভাষিক এবং উপলক্ষনির্ভর নানা উপাদানের সংখ্যা সবসময় সংখ্যাতাত্ত্বিক সাধারণীকরণে সাহায্য করে না। শব্দের সংখ্যাগণনা বিপুল পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করলেও একটি বস্তুর সাহিত্য-মাধ্যমরূপে বিচার অস্পষ্ট হয়ে যায়। পাঠকও ক্লান্ত হন আলোচকের বৈজ্ঞানিক মানসিকতায়। আর যে গুণে এক রচনা সাহিত্য হল তা অনালোচিত থেকে যায়। এদের সাহায্যে যন্ত্রগণক এবং সংখ্যাতত্ত্ব সক্রিয় থাকলেও সাহিত্য-পাঠকের মনে তা অক্রিয় থেকে যায়।

১.১১ ❑ আমাদের মতামত : নূতন পথ

শৈলীবিজ্ঞানকে একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞাননির্ভর আলোচনার অনুগামী করার বাধা এক নয়, অনেক। আমরা সব কিছুকে যথাযথ, সংক্ষিপ্ত এবং বৈজ্ঞানিক করার কুসংস্কারে ভুগি। বিজ্ঞানীর সত্য যদি অভ্রান্ত এবং শেষ কথা না হয়, তবে শৈলীবিজ্ঞানকে চূড়ান্তরূপে একবর্গীয় করে দেখার মধ্যে একটা ভ্রান্তির দর্শন আছে। কেননা আমরা জানি, শুধু বাচিক নয়, অ-বাচিক মানবীয় আচরণেও শৈলী আছে। এই ভাষাতিরিক্ত আচরণ অনেক সময় বক্তা বা লেখকের বিশেষ সামাজিক শ্রেণী, সংকেত-ভাষারূপ ব্যাখ্যা করে দেয়। অনেক সময় নীরবতা একটি রচনা বা কৃতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। চারপাশের জনতার কোলাহলে যে ব্যক্তি বধির, নির্বাক কিংবা অন্ধ, তার আচরণের বিশেষ ভূমিকা আছে। লেখককে শৈলী নির্বাচন করতে গিয়ে এর কথাও মনে রাখতে হয়। কবিতায়

মাঝে মাঝে এমন ফাঁক থাকে, যার সম্পর্কে 'নিঃশব্দের তর্জনী' কথাটি খাটে। এই শূন্যতার পূরণে পাঠককে সচেতন করার তাগিদ কবির থাকে। কিন্তু এর ব্যাখ্যা ভাষাবিজ্ঞানে মেলে না।

আবার অবয়বগত কয়েকটি দিক এই শৈলীভাষাবিজ্ঞানে বিশেষ আলোচিত নয়। যেমন, বাক্যের পরম্পরা তাঁরা মানেন। কিন্তু এই পরম্পরা সাজানোর কৌশল (সমান্তরালতা, বিপ্রতীপ, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, অধ্যায়) একেকজন লেখকের ক্ষেত্রে একেকরকম। কয়েকজন আবার অনুচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ-অধ্যায় সাজানোর ব্যাপারে ছাপার সুবিধা-অসুবিধা কিংবা ভুলের কথাও তোলেন। কিন্তু দুটি বাক্যে অনুচ্ছেদ আর ত্রিশটি বাক্যে অনুচ্ছেদ সাজানোর দায়িত্ব কি একা মুদ্রক নেন? 'লিপিকা'র মুদ্রণপ্রমাদ ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তার পরিবর্তন চাননি। ঐ মুদ্রণপ্রমাদের ফলে বাংলায় কাব্যশৈলীর একটি নূতন রূপ দেখা দিয়েছিল, এমনকি রবীন্দ্র-সাহিত্যেও। মাঝে মাঝে লেখক পরিচ্ছেদ না এনে অনুচ্ছেদের মধ্যে পরিচ্ছেদের মতো সময়, ঘটনাস্থলকে পালটে একটা বৈচিত্র্য আনেন। পাঠক সচেতনভাবে বোঝে কাহিনি, চরিত্র এবং সময়ের মোড় ফিরছে। একে পরিচ্ছেদ বলতে পারি না, উপ-পরিচ্ছেদ (সাব-চ্যাপ্টার) বলতে পারি। এই ধারণার বিস্তার ভাষাবিজ্ঞানের সাধ্যের বাইরে।

কখনও কখনও একটি রচনায় দুটি কাল বহমান থাকে। লেখক এই স্রোতকে দুভাবে দেখেন—প্রকৃত (রিয়াল টাইম), আপাত (অ্যাপারেন্ট)। বাইরের দিক থেকে চেতনাপ্রবাহ বা কথনরীতিতে কয়েক ঘণ্টা বা দিনের হিসাব পাই। অথচ অন্তরঙ্গে দেখি একটি মানুষের দীর্ঘকালীন সময় স্থান পেয়েছে। এর প্রথমটি আপাত, দ্বিতীয়টি হল প্রকৃত। শৈলীভাষাবিজ্ঞানীরা সময়কে তাদের মানক তালিকায় উল্লেখ করলেও এই বিভাজনে যে শৈলীর রকমফের হয়, সে বিষয়ে নীরব।

এইসব বিষয় কি শৈলী-অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য? আমাদের তা মনে হয় না। কেননা একটি কৃতির বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গে ছড়ানো এইসব বৈশিষ্ট্যের স্তর আলোচনা করলে কৃতি ও লেখকমনের প্রতি সুবিচার করা হয়। একটি কৃতিতে কত ভাবনার জট মেলা আছে, তার হদিশ কি শৈলীবিজ্ঞানী নেবেন না? রোলঁ বার্তের তত্ত্ব পুরোটা মেনে নিতে পারি না। কিন্তু লেখক-পাঠকের সংপ্রেষণকর্মের এসব জটিলতার সন্ধান এযাবৎ করা হয়নি। উপন্যাসের মতো সবচেয়ে জটিল সাহিত্যরূপ কিংবা নাটকের মতো বিমিশ্র (কম্পোজিট) রূপকর্মে লেখকের প্রকাশকৌশল বিচিত্র হয়ে থাকে। এমনকি একজন লেখকের একটি কৃতিতে ভাষাতিরিক্ত উপাদানগুলির সমাহার-বিন্যাস লক্ষ করা দরকার। গভীরভাবে এই সমাহার-বিন্যাসের অভিনবত্ব একজন বিশেষ লেখকের ক্ষেত্রে একইরকম নাও হতে পারে। তিনি বিষয়-প্রকরণের একরৈখিক বিন্যাস রচনা করেন না। করলে তাঁর লেখার পাঠক এক দশক অবধি সংগৃহীত হয়। পরে ঐতিহাসিক গুরুত্বে তিনি আলোচিত হন। এঁরা লেখক বটে, রচয়িতা নন। নানা প্রাতিষ্ঠানিক দাক্ষিণ্যে এঁরা বিকশিত হন। শিল্পগুণের নির্মিতির চাবিকাঠি এঁদের হাতে থাকে না। এঁদের রচনায় কল্পনার স্ফুরণ নেই, আছে প্রকাশহীনতার ছাপ।

প্রসঙ্গ (সাবজেক্ট ম্যাটার) প্রথম দিকের কিছু শৈলীভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টি কাড়লেও পরে তাঁরা সকলেই ভাষিক দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। অথচ লেখক কী প্রকাশ করতে চান অথবা তাঁর সংপ্রেষণের বিষয়ভূমি কী, এই বোধ স্পষ্ট না হলে অবয়বের সমগ্রধারণা বিনষ্ট হয়ে যায়। লেখক কীভাবে এবং কী বলেন—দুটোই সমান জরুরি।

এই বিষয়ধারণা প্রচলিত সাহিত্যালোচকরা যে ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন, তাও বলা যায় না। একটি সামাজিক শ্রেণির একটি চরিত্রকে নিয়ে লিখলেই যে শ্রেণিসাহিত্য বা সামাজিক সাহিত্য (ক্লাশ অর সোস্যাল লিটরেচর) গড়ে ওঠে না, এ কথা তাঁরা বোঝেন নি। এ কথা না বুঝে কখনও জাতিবিচারের ঝোঁকে, কখনও 'দলীয় ভক্তির অদ্ভুত দৈবে' চরিত্রকেন্দ্রিক রচনাকে সামাজিক আখ্যা দিয়েছেন। আবার সমাজের সমস্যা থাকলেও একটি পরিবারের বিশেষ গড়নে তা পারিবারিক হয়ে ওঠে। এই সামান্য ব্যাপারটি প্রচল সাহিত্যালোচনায় অনেক সময় একটা অদ্ভুত সিদ্ধান্ত টানতে বাধ্য করেছে মাঝারি মাপের আলোচকদের।

একটি স্থানীয় বা আঞ্চলিক মানবজীবনের ছবি আঁকতে গিয়ে উপভাষার বোধ লেখকের থাকা প্রয়োজন। কিন্তু উপভাষী অঞ্চলের ছবি রচনা স্থানীয় রং (লোকাল কালার) ব্যবহার করতে গিয়ে উপভাষা রচনার ক্ষতি করে। সংপ্রেষণকর্ম সেখানে উপলব্যথিতগতিতে চলে। উপভাষাকে যে আদর্শ চলিত পাঠকের কাছে পাঠযোগ্য করতে হবে এ কথা তাঁরা ভুলে যান। রচনাটি উপভাষাপ্রয়োগের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। লেখক আবার পাঠককে বোঝানোর জন্য সংখ্যা বা তারকাচিহ্ন যোগ করে পাদটীকা লেখেন। আমরা কবিতা বা রচনাটি পড়তে চাই, উপভাষী মানুষদের জানতে চাই—এই কৌতূহলকে পদে পদে উপভাষাশব্দাবলি বাধাদান করে। তাই উপভাষা প্রয়োগের একটা মাত্রা থাকা উচিত। নইলে তা উপভাষী মানুষের হৃদয়সংবাদ হলেও ব্যাপক পাঠকের কাছে নির্দয়সংবাদ। এই মাত্রাজ্ঞান ভাষিক হলেও সামাজিক। অর্থাৎ শৈলীবিজ্ঞানীকে ভাষার সামাজিক ব্যাকরণজ্ঞান অর্জন করতে হবে।

কখনও লেখক একটি রচনায় আদর্শ ভাষারূপ থেকে শুধু সরেই আসেন না, বহু দূরে চলে যান। বাইরের দিক থেকে ভাষার ঠাট বজায় থাকলেও তার বৈপরীত্যবোধ এবং নিয়মভঙ্গ আমাদের ভাবায়। আমরা নিয়ম গড়তে চাই। এখানে দুর্বোধ্যতার প্রশ্ন আসে। আগে-বলা উপভাষা বা প্রাচীন ভাষাসূত্রে আসা এই বিশেষত্ব কি লেখকের ইচ্ছাকৃত না তার মন ও মননে কোথাও এর বীজ ছিল? লেখক কি প্রচলিত ভাষাবিন্যাসে তার বক্তব্য ফোটাতে পারবেন না বলে মনে করেন? তিনি কেন গূঢ়-ভাষার (এস্টোরিক ল্যাংগুয়েজ) আশ্রয় নেন? এই আশ্রয় নেওয়ার কারণ কি ঐতিহ্যচেতনার সঙ্গে ইচ্ছাকৃত সংযোগহীনতা? ব্যক্তিবচনে এইসব রচনা, কবিতা দীপ্ত হলেও এই নৈরাজ্য, শব্দার্থের বিশৃঙ্খলাকে লেখক কতদূর আঁকড়ে থাকতে পারেন, সেটা দেখা প্রয়োজন। আধুনিক কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা চরমে উঠেছে। অথচ লক্ষ করি এই দুর্বোধ্যতার চীনা দেওয়াল ভেঙে মুক্ত প্রান্তরের ভাষা তাঁদের অজানা ছিল না। রচয়িতার এই দুর্বোধ্যতাকে সত্যরূপে শৈলীবিজ্ঞানী বিচার করবেন। একটা অসম্ভব ঘটনাকে এঁরা অনেক সম্ভব করেছেন। ঐ দুর্বোধ্যতার মধ্যে ক্রিয়া-প্রবাদের লৌকিক বুনোট ছড়িয়ে আছে। এই বুনোটটির ব্যাখ্যান প্রয়োজন।

প্রাচীন কাব্যকে একালের মতো করে বলার কাজ সাহিত্যের একটি প্রজাতি (জঁর) গড়ে তুলেছে। এই ক্ষেত্রে পুনর্নির্মাণের প্রশ্ন আসে। অথচ এর প্রকৃতি একমাত্রিক নয়। একালীন অনুবাদক বা অনুসারক সবসময় ই. ভি. রিউর বলা 'সম প্রভাব নীতি' (ইকুয়াল এফেক্ট থিওরী) মেনে চলেন না। বরং বলা ভালো মানা যায় না। প্রাচীনকালে কাব্যটি পাঠকদের যেভাবে প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছিল, একালে তেমনভাবে প্রভাবিত করবে কী করে? শুধু সম? এখানে বদলায়নি, মানসিকতা-কাব্যপুরুষের ভেদ ঘটে গেছে। তাই প্রাচীনের অনুবাদের

অনেকগুলো পথ দেখি—মূলের অনুসরণ (বাচিক বা ছন্দগত), মূলের সঙ্গে সংযোজন, মূলের রূপান্তর। প্রথম কাজটি কঠিন। একালীন ভাষায় লিপ্যন্তরকর্ম একটা আড়ষ্ট, অস্পষ্ট রচনার জন্ম দেয়। সংযোজনে আর কিছু না হারালেও মূল ভাষ্য বদলায়। আর রূপান্তরে লেখক স্বাধীনতাকামী। তিন জায়গাতেই মূলের প্রসঙ্গ-প্রকরণ অক্ষুণ্ণ থাকে না। তা থাকতে পারে না। কেননা মূল ভাষা থেকে একালীন ভাষা, মূল যুগ থেকে এ যুগের ভাবনার মধ্যে অপার ব্যবধান। শৈলীবিজ্ঞানী ভাষাতিরিক্ত আলোচনায় এগুলি ধরবেন।

ছাত্রদের আমরা গুরু-চণ্ডালীর জন্য দোষ দিই। আবার শ্রেষ্ঠ লেখকরা এই ত্রুটিমুক্ত নন। তাদের ক্ষেত্রে যা আর্য প্রয়োগ, আমাদের মতো সাধারণজনের পক্ষে তা কি অনার্য প্রয়োগ? একে লেখকের অনিচ্ছাকৃত ভুল বলতে পারব কি? আসলে সাধু-চলিতের ভেদরেখা আমরা টানতে পারিনি। অর্থনীতির মাপকাঠিতে সমাজবর্ণন চলে। কিন্তু মানুষের ভাষার মধ্যে শ্রেণিভেদ যতটা, শ্রেণিমিশ্রণও ততটা। বহু লেখা চলিতে লিখিত, অন্তরঙ্গে ভাষাগুণ সাধুর। আবার বিপরীতক্রমও দেখি। ভাষার লেখ্যরূপের সঙ্গে জানুসের মন্দিরের একটা মিল আছে—সেখানের দুটি বিপরীতমুখী দরজার মতো সাধু-চলিত দুজনেই সহজভাবে আসে। তাই সাধু-চলিতের যে ব্যবধান টেনে বৈয়াকরণরা তৃপ্ত, তার মূল্য শৈলীবিজ্ঞানী সবটা স্বীকার করতে পারেন না। শিল্পীর রচনায় কেন এরা পাশাপাশি থেকে যায়, তার বিচার করা এখনও হয়নি।

সাহিত্যের নানান শাখায় আলোচনার (ডিসকোর্স) একটা বিভ্রম তৈরি করা হয় বলে শৈলীভাষাবিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন। অনেক সময় এই বিভ্রম-ধারণাকে সরিয়ে পাত্র-পাত্রী লেখকের মতো আলোচনা করতে থাকে। তাদের আলোচনাকে তখন লেখক থেকে আলাদা করা কঠিন। যদিও একটি কৃতিতে সমস্ত আলোচনাই লেখকের সৃষ্টি, তবু তাতে পরিবর্তক (ভেরিয়েবল) আছে। এই চলনধর্ম (ভেরিয়েবিলিটি) অস্বীকার করে যদি তাতে ধ্রুবকের অপরিবর্তনীয়তা আরোপ করা হয়, তবে আলোচনাগুলির স্বাতন্ত্র্য থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় নাটক উপন্যাসে লেখকের কণ্ঠস্বর নানা চরিত্রে শুনতে পাই। এখানে চরিত্রগুলির স্বাতন্ত্র্য এক নির্বিশেষ নিরপেক্ষ বা ধ্রুবকে স্থান পায়। এখানে নিয়ম ভাঙা হল বা নূতন নিয়ম গড়া হল, এ বক্তব্য শৈলীবিজ্ঞানী ছাড়া কে বলবেন?

বহু ক্ষেত্রে লেখক বাক্য পুরো লেখেন না। বাক্যাঙ্গে অপূর্ণতা দেখতে পাই। একে শুধু ব্যাকরণ-ভাঙা না লেখকের সংপ্রেষণের বিশেষত্ব বলব, এ নিয়ে তর্ক হতে পারে। লেখক এখানে অপূর্ণ বাক্য এইজন্য সাজান না যে, চরিত্রগুলি যা বলছে, সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নয়। বরং পাঠকমনে লেখক একটা সম্ভাব্যতার সংকেত ছড়িয়ে দিতে চান। বর্ণনাতেও এই কৌশল দেখি। সেখানে লেখক একটা অনিশ্চিতির আশঙ্কা বুনে দেন। এইসব অপূর্ণ (শুধু রূপগত নয়, অর্থগতও) বাক্য কীভাবে রচনাকে প্রকাশযোগ্য করল, পাঠকের কাছে এরা বাধা সৃষ্ট করে কিনা, তা এযাবৎ ভাবা হয়নি। চেতনাপ্রবাহধর্মী রচনায় (যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) এজাতীয় অপূর্ণ বাক্য দেখতে পাই। শুধু পূর্ণ বাক্য নয়, এমন অপূর্ণ বাক্য কেন, এ প্রশ্নেরও উত্তরসন্ধান করতে হবে।

কোনো কোনো কৃতিতে দেখি লৌকিক প্রবাদ, বাক্যাংশ, ক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োগ। এ কি স্বদেশিয়ানা অথবা নিজের বিষয়কে পৌঁছে দেবার স্বাভাবিক প্রয়াস? যে দুর্বোধ্যতার দায়ে প্রাচীন-আধুনিক লেখকরা সমালোচকের দরবারে শাস্তি পেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে লোকভাষার এই প্রভাব কেন? বক্তব্যের নূতনত্ব বজায়

রেখেও তাঁরা কবিতার অঙ্গে লোকভাষা ধারণ করেছেন। সাধারণের ভাষা (ল্যাংগুয়েজ অব দা মাসেস) তাঁদের রচনায় একটা বহমানতা এনেছে, একথা বলা যায়। সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে এমনকি মধুসূদনের রচনায় কবিরা নিজেদের কাঠিন্যের দায় থেকে কীভাবে মুক্তি খুঁজেছেন? বাংলা ভাষার ঐসব লোক-বিশেষত্ব চারপাশের জীবনের ভাষা থেকে এদের রচনায় উঠে এসেছে, এ কথা বলা যায়। এই অনুসন্ধান এখনও অসমাপ্ত আছে।

গদ্যরচনায় একটা মাঝারি ভঙ্গি অনেকে নিয়েছেন। সেখানে সাধু-চলিত নয়, মাঝখানের এক পথ আবিষ্কৃত হয়। আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের গদ্যলেখকরা এইজন্য সময় পেরিয়ে আমাদের কাছে প্রিয় হয়ে আছেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ যাঁরা এই মধ্যম শৈলীর অনুসারী, তাঁরা সাধু-চলিতের চরমতা থেকে মুক্ত। এই শৈলীতে দর্শন-বিজ্ঞানের জটিলতম বিষয় অনায়াসে এঁদের গদ্যে রূপ পেয়েছে। এঁদের গদ্যে বিষয় ও প্রকাশের স্পষ্টতা চোখে পড়ে। কখনো ক্রিয়াসর্বনাম বা তৎসম শব্দের ঘনত্ব সাধু ভাষার মতো নয়, আবার চলিত ভাষার সর্বাঙ্গীণ আদর্শপালন নেই। কালবৈগুণ্যে আমরা বিদ্যাসাগরকে সাধু ভাষার জনক মনে করি। কিন্তু মধ্যম শৈলীর গদ্য বিদ্যাসাগরী গদ্যেও বিরল নয়। এখানে অনেকে বিষয়ানুবন্ধতার প্রশ্ন তুলতে চান। কিন্তু এঁদের রচনার আকর্ষণ বিষয়ানুবন্ধতা অথবা সংপ্রেষণের সহজ কৌশলে, তার ব্যাখ্যা বাংলায় এখনও হয়নি।

ইংরাজ রোমান্টিকদের নাম বাঙালি কবিদের বিশেষণে যোগ করে আমরা এককালে কাব্যালোচনায় পরিতৃপ্ত হতাম। যেমন, বাংলার শেলী (রবীন্দ্রনাথ) বাংলার বায়রন (নবীনচন্দ্র সেন)। ইদানীং বিশ্বসাহিত্য পড়ার সূত্রে বাঙালি গদ্যলেখকদের য়ুরোপীয় মনীষীদের সঙ্গে তুলনার প্রবণতা বাড়ছে। এভাবে স্পেংলার, এলিঅট বাঙালি গদ্যলেখকের বিশেষণে কিংবা গদ্যবিচারে ফরাসি বা জার্মান গদ্যের প্রভাবের কথা আসছে। যাঁরা এই অযথার্থ কথা ব্যবহার করেছেন, তাঁদের লেখায় ফরাসি বা জার্মান গদ্যের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ নেই। আবার এর বিপরীতে সংস্কৃতানুসারিতার অভিযোগ শোনা যায়। সেখানেও সংস্কৃত গদ্যগঠনের নিয়মাবলি অনালোচিত থাকে। এসব সমালোচকরা দায়িত্বহীন। একটি লেখকের গদ্যে স্বদেশি বা বিদেশি গদ্যের প্রভাব বলতে গেলে ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হবে। বিশেষ করে সেখানের দুই ভাষার তুলনার নিয়মাবলিগুলোর ক্ষেত্রে।

আমরা এখানে যে শৈলীবিজ্ঞানকে গ্রহণ করছি, তা বাচিক (ভার্বাল) ব্যবহারকে গুরুত্বহীন মনে না করেও একটি সাহিত্যকৃতির (লিটারারী টেক্সট) বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হবে। কাজেই এই বইয়ের আলোচনা মানুষের সমস্ত ভাষিক এবং অভাষিক স্তরের শৈলীব্যাখ্যান হয়ে উঠবে না। একটি কৃতি, এক বা একেক ধরনের লেখকের লিখিত রচনাই এখানে বিশ্লেষিত হবে। তাই একে পূর্ণ শৈলীবিজ্ঞান না বলে সাহিত্যিক শৈলীবিজ্ঞান (লিটারারি স্টাইলিস্টিকস্) বলা ভালো। এই আলোচনায় একটি সাহিত্যকর্মকে বোঝার চেষ্টা থাকবে। শুধু ধ্বনি-বাক্য-অর্থ কিংবা ভাষাবৈজ্ঞানিক উপাদান বিচার করলে শিল্পের ব্যবচ্ছেদই করা হয়। আবার পূর্ণতা, রসধারণা সক্রিয় থাকলে উপাদানের শিল্পগুণ আড়ালে চলে যায়। সাহিত্যের বিশেষ ভাব ভাষার মাধ্যমে যে শিল্পসৌন্দর্য লাভ করে, সেই সৌন্দর্যবিচারকে বুঝতে সাহায্য করে শৈলীবিজ্ঞান—এমন একটা ব্যাপক ধারণা আমরা দিতে চাই।

রসবাদ, ভাববাদ, এমনকি কঠোর ভাষাশৈলীবিজ্ঞান আমাদের অনেক জিজ্ঞাসার উত্তর দেয় না। তাই

ভিনোগ্রাদফের বলা শৈলীবিজ্ঞানের একটি মহল আমাদের বিশ্লেষণের পক্ষে উপযোগী মনে হয়েছে। সেটি হল স্বাধীন শৈলীবিজ্ঞান (ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টাইলিস্টিকস্)। এই শৈলীবিজ্ঞান স্বাধীন এই কারণে যে তা প্রয়োজনমতো ভাষাবিজ্ঞান এবং সাহিত্যালোচনা থেকে সাহায্য নেবে। এই কাজ কঠিন সন্দেহ নেই। অথচ সমালোচক যদি নিজের গঠন, সাহিত্যবোধ এবং ভাষাবিজ্ঞানের সংমিশ্রণে সচেতন হন, তবে এই কাজ সুসম্পন্ন হবে। আমরা একটি কৃতির শৈলীবৈজ্ঞানিক উদ্দীপকগুলোর সন্ধান করতে চাই যা লেখক-পাঠককে সম্পর্কে বাঁধে। আবার একই সঙ্গে এই কাজ একটি কৃতির সামগ্রিক আবেদনের ফলাফলকেও ব্যাখ্যা করতে পারে। এখানে অধিকারীভেদের প্রশ্ন উঠতেই পারে। অধিকার অর্জন করতে গিয়ে সাহিত্যবোধ ও সমালোচনার মন হারিয়ে যাবে না, এমন কথা কি কেউ বলতে পারে? তাই মধ্যবিত্ত সমালোচকের পুঁজি নিয়ে আমরা এই শৈলীবিজ্ঞানের প্রায়োগিক কুশলতাকে পরবর্তী অংশে প্রকাশের চেষ্টা করব।

এই আলোচনা-পর্ব খানিকটা 'ওমনিয়াম গ্যাদারাম' জাতীয়। তাই 'সংজ্ঞা ও তত্ত্বের খোঁজে' অংশটিকে বিভিন্ন মতের সংকলনকর্ম বলতে বাধা নেই। কেননা বহুজ্ঞানী পাঠক জানেন, এসব কোন্‌খান থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। যদিও আমরা সাধ্যমতো ব্যাখ্যানেরও চেষ্টা করেছি। আমাদের ইচ্ছা ছিল শৈলীর সংজ্ঞা, অস্তিত্ব, শৈলীবিজ্ঞানের নানা মত সংগ্রহ করে একটি মালা গাঁথা। যুক্তির সুতো সেই কাজকে সম্ভবপর করে তুলেছে কিনা, তা বিজ্ঞজনেরা বিচার করবেন। উৎসাহী পাঠক আরও জানার নেশায় উল্লেখপঞ্জির মূল বইগুলি পাঠ করবেন। সংক্ষেপে, শৈলীবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কথাবার্তার সঙ্গে বাঙালি পাঠকের অপরিচয়ের ব্যবধান কমিয়ে আনাই এই আলোচনার লক্ষ্য ছিল।

উল্লেখসূচি

১. 'রীতি কনসিস্টস এসেনসিয়ালি অব্ দা অবজেকটিভ বিউটি অব্ রিপ্রেজেন্টেশন (অব দা ইনটেনডেড আইডিয়া), অ্যারাইজিং ফ্রম আ প্রপার ইউনিফিকেশন অব্ সার্টেইন ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড এক্সসেলেন্সেস, অর্ ফ্রম অ্যান অ্যাডজাস্টমেন্ট অব সাউন্ড অ্যান্ড সেন্স। ইট ইজ, নো ডাউট, রেকগনাইজড দ্যাট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আইডিয়াজ শুড ফাইন্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এক্সপ্রেশন। বাট অ্যাট দা সেম টাইম, দা রীতি ইজ নট, লাইক দা স্টাইল, দা এক্সপ্রেশন অব পোয়েটিক ইনডিভিজুয়ালিটি, বাট ইট ইজ মেয়ারলি দা আউটওয়ার্ড প্রেজেন্টেশন অব্ ইটস বিউটি কলড ফোর্থ বাই আ হার্মোনিয়াস কম্বিনেশন অব্ মোর অর লেস ফিক্সড লিটারারি এক্সসেলেন্সেস। অব্ ক্লোর্স, দা এক্সসেলেন্সেস আর সাপোজড টু বি ডিসার্নেবল ইন দা সেন্স অব ইমপোর্ট, অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইন দা ভার্বাল অ্যারেঞ্জমেন্ট, বাট দিস সাবজেকটিভ কনটেন্ট ইজ নট ইকুয়াভ্যালেন্ট টু দা ইনডিফাইনেবল ইলিমেন্ট অব ইনডিভিজুয়ালিটি হুইচ কনস্টিটিউটস দা চার্ম অব গুড স্টাইল।

(দা হিস্ট্রি অব্ স্যাংস্ক্রিট পোয়েটিকস, রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়)

২. মারীর এই উদ্ধৃতিটির বাকি অংশ এইরকম

'হোয়ার থট প্রিডোমিনেটস; দেয়ার দা এক্সপ্রেশন উইল বি ইন প্রোজ, হোয়ার ইমোশন প্রিডোমিনেটস, দা এক্সপ্রেশন উইল বি ইউডিফারেন্টলি ইন প্রোজ অর পোয়েট্রি, একসেপ্ট দ্যাট ইন দা কেস অব ওভারহোয়েলমিং ইমিডিয়েট পার্সোনাল ইমোশন, দা টেনডেন্সি ইজ টু ফাইন্ড এক্সপ্রেশন ইন পোয়েট্রি। স্টাইল ইজ পারফেক্ট হোয়েন দা কমিউনিকেশন অব দা থট অর ইমোশন ইজ এগজ্যাক্টলি অ্যাকমপ্লিশড; ইটস পজিশন ইন দা স্কেল অব অ্যাবসলিউট গ্রেটনেস, হাউএভার, উইল ডিপেন্ড আপন দা কমিপ্রিহেন্সিভনেস অব দা সিস্টেম অব ইমোশনস অ্যান্ড থটস টু হুইচ দা রেফারেন্স ইজ পারসেপ্টেবিল।'

৩. 'স্কাজ'—এক ধরনের কাহিনি যার ভাষাবৈজ্ঞানিক বিশেষত্ব সহজেই পাঠককে অনুমতি কথক এবং গ্রন্থকারের মধ্যে পার্থক্য চিনিয়ে দেয়।

৪. শুভা দাশগুপ্ত 'কালক্রম' পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, নবপর্যায় (১৯৮৬)-এ 'সাহিত্যসমালোচক রোলঁ বার্ত' বলে একটি মনোজ্ঞ নিবন্ধ লিখেছেন পুষ্কর দাশগুপ্তের সহায়তা নিয়ে।

৫. ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৬৯), 'ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল', ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস, ব্লুমিংটন।

৬. ভিনোগ্রাদফ, ভি. ভি. (১৯৬৩) ক. 'সাবজেক্ট অ্যান্ড স্টাইল', মস্কোভা; খ. স্টাইলিস্টিকস : থিওরি অব্ পোয়েটিক্স, মস্কোভা।

উৎস গ্রন্থ ও প্রবন্ধ

বাংলা

আশিসকুমার দে (১৯৮০), 'শৈলী ও শৈলীবিজ্ঞান', 'ভাষা' পত্রিকা, ২ : ২।

উদয়নারায়ণ সিংহ (১৯৮৭), 'কবিতার ভাষাতত্ত্ব ও আজকের বাংলা কবিতা', গাঙ্গেয়, কবিতার ভাষা (বিশেষ সংকলন)।

পবিত্র সরকার (১৯৮১), 'বাংলা গদ্য রীতিগত অনুধাবন', বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা (সংকলন), সমতট প্রকাশনী। (১৯৮৫), গদ্যরীতি পদ্যরীতি, সাহিত্যলোক।

(১৯৮৭), শৈলীবিজ্ঞানী স্ট্রাকচারালিস্ট প্রাগ্‌ভূমিকা, গাঙ্গেয়, কবিতার ভাষা (বিশেষ সংকলন)।

শুভা দাশগুপ্ত (১৯৮৬), 'সাহিত্যসমালোচক রোলঁ বার্ত', কালক্রম ১ : ১, নবপর্যায়, কলকাতা।

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৯৭৯), 'কাব্যালোক', পঞ্চম সংস্করণ, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং।

ওড়িয়া

গগনেন্দ্রনাথ দাশ ও পঞ্চানন মহান্তি সম্পাদিত (১৯৮৯), 'শৈলীবিজ্ঞান', ওড়িয়া গবেষণা পরিষদ, কটক।

ইংরেজি

১. বারবাশ, য়ুরি, (১৯৭৭), 'ঈস্থেটিকস অ্যান্ড পোয়েটিকস', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স।

২. চ্যাপম্যান, রেমন্ড (১৯৭৩), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটরেচর', এডওয়ার্ড আর্নল্ড পাবলিশার্স।

৩. চ্যাটম্যান, সেম্যুর (সম্পাদিত, ১৯৭১), 'লিটারারি স্টাইল, আ সিম্পোসিয়াম', অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

৪. ক্রীস্টাল, ডেভিড অ্যান্ড ডেভি, ডেরেক (১৯৭৯), 'ইনভেস্টিগেটিং ইংলিশ স্টাইল', ইন্ডিয়ানা য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

৫-৬. এংকভিস্ট, নিলস এরিক এট অল (১৯৬৪) 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল', ও. ইউ. পি.। (১৯৭৩), 'লিংগুইস্টিক স্টাইলিস্টিকস', মোটন।

৭. ফ্রিম্যান, ডোনাল্ড সি. (সম্পাদিত, ১৯৭০), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি স্টাইল', হোল্ট, রাইনহার্ট অ্যান্ড উইন্সটন।

৮. ফ্রায়েড, ভি. (সম্পাদিত, ১৯৭২), 'দা প্রাগ স্কুল অব লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড ল্যাংগুয়েজ টিচিং', অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

৯. গারভিন, পল এল, (সম্পাদিত ও অনূদিত, ১৯৬৪), 'এ প্রাগ স্কুল রিডার অন ঈস্থেটিকস : লিটারারি স্ট্রাকচার অ্যান্ড স্টাইল'।

১০. গ্রে, বেনিসন (১৯৬১), 'স্টাইল : দি প্রব্লেম অ্যান্ড ইটস সল্যুশনস্', মোটন।

১১. মুখার্জী, রমারঞ্জন, 'হিস্ট্রি অব সাংস্ক্রিট লিটারারি ক্রিটিসিজম'।

১২. মারী, মিডলটন (১৯৬১), 'দা প্রব্লেম অব্ স্টাইল', রিপ্রিন্ট এডিশন, অক্সফোর্ড য়ুনিভার্সিটি প্রেস।

১৩. পেটার, ওয়াল্টার (১৯৬৭), 'অ্যাপ্রিসিয়েশনস উইথ অ্যান এসে অন স্টাইল', রূপা এডিশন।

১৪. সেবক, টমাস এ. (সম্পাদিত, ১৯৬০), 'স্টাইল ইন ল্যাংগুয়েজ', দা এমন, আই. টি. প্রেস, ম্যাসাচুসেটস।

১৫. স্পিৎজার, লিও (১৯৭৬), 'লিংগুইস্টিকস অ্যান্ড লিটারারি হিস্ট্রি', প্রিন্সটন য়ুনিভার্সিটি প্রেস, প্রিন্সটন।

১৬. টার্নার, জে. ডব্লিউ. (১৯৭৩), 'স্টাইলিস্টিকস', পেঙ্গুইন বুকস, মিডিলসেক্স।

১৭. উলমান, স্টিফেন (১৯৬৪), 'ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড স্টাইল', বেসিল ব্ল্যাকওয়েল।

১৮. জিস, আভনের (১৯৭৭), 'ফাউন্ডেশন অব্ মার্কসিস্ট ঈস্থেটিকস্', প্রোগ্রেস পাবলিশার্স।